মুসলমানী নেসাব

আরকানে ইসলাম ও ওযীফায়ে রাসূল (ﷺ)

ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা
আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহ্হার সিদ্দীকী
সাহেবের নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা)
অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ
www.assunnahtrust.com

أركان الإسلام والأذكار المسنونة

تأليف: دكتور خوندكار أبو نصر محمد عبد الله جهانغير
دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض،
وأستاذ بالجامعة الإسلامية، كوشتيا، بنغلاديش.

মুসলমানী নেসাব

আরকানে ইসলাম ও ওযীফায়ে রাসূল (ﷺ)

ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা
আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহ্হার সিদ্দীকী
সাহেবের নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে
ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

প্রকাশক
উসামা খোন্দকার
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা)
বি. বি. রোড. ঝিনাইদহ-৭৩০০
ফোন ও ফ্যক্স: ০৪৫১-৬২৫৭৮; মোবাইল: ০১৭১১১৫২৯৫৪

প্রথম সংস্করণ: যুলহাজ্জ ১৪২৩ হি, (ফেব্রুয়ারী ২০০৩ ঈসায়ী)
দ্বিতীয় সংস্করণ: শাবান ১৪৩২ হি.
জুলাই ২০১১ খৃ.

MUSOLMANI NESAB: ARKAKANE ISLAM O OZIFAE RASUL. by Professor Dr. Khandaker Abdullah Jahangir. Published by As-Sunnah Pablications, Jaman Supur Market, B. B. Road, Jhenidah-7300. January 2007.

সিদ্দিক বংশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুরফুরার পীর, শিরক, কুফর ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন মুজাহিদ, মুসলিম ঐক্যের অগ্রদূত
হযরত মাও. আব্দুল কাহ্হার সিদ্দিকী আল-কুরাইশী সাহেবের

বাণী ও নির্দেশনা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। নাহমাদুহু ওয়া নুসালী 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ,

কুরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ ইল্‌ম ও অর্জিত ইলমকে হৃদয়ের গভীরে ইয়াকীন ও কর্মে পরিণত করে সুন্নাতের পূর্ণ অনুসারী রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের যুগের মতো হৃদয়ের অধিকারী মুসলিম তৈরি করার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল মুসলিম সমাজে পীর মাশায়েখগণের দরবার। সমাজের অগণিত সাধারণ মানুষদের জন্য এগুলিই ছিল ইল্‌ম ও আমলের মাদ্রাসা। বিশেষত ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের দুর্দিনে, ক্রুসেড ও তাতার হামলার পরে সাধারণ মানুষদের মধ্যে ইল্‌ম, ঈমান ও আমল বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এসকল ত্যাগী মাশাইখগণ। বাংলা-ভারতে ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করেছেন মূলত তাঁরাই।

কুরআন সুন্নাহর আলোকে আল্লাহর পথে চলে হৃদয়কে জাগতিক লোভ, লালসা, হিংসা, বিদ্বেষ থেকে মুক্ত করে আখেরাতমুখী করা ও আল্লাহর প্রেমে ভরে তোলাই তাসাউফ। কুরআন ও সুন্নাহর প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন, বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন, হালাল উপার্জন, হারাম বর্জন ও ফরয পালনের পরে নফল ইবাদতের মধ্য থেকে সহজ ও অধিকতর উপকারী কিছু ইবাদত বেছে দিয়ে, প্রয়োজনে ইবাদতে মনোযোগ ও তৃপ্তি অর্জনের জন্য কিছু রিয়াযাত বা অনুশীলন শিখিয়ে আগ্রহী মুসলিম বা মুরীদকে আল্লাহর পথে নিয়ে যাওয়ার পথই হলো "তরীকত"।

কিন্তু সব ভালো বিষয়ের মতো পীর-মুরীদীর ধারাতেও ভেজাল ঢুকেছে অনেক আগে থেকেই। তাসাউফের নামে অগণিত ভণ্ড, ধোঁকাবাজ টাউট, মিথ্যাবাদী দাজ্জাল, যাদুকর যিনদীক বা কর্মবিমুখ ভিক্ষুক ধোঁকা দিয়েছে সমাজের অগণিত সরলপ্রাণ মানুষকে। যে পীর মাশাইখগণ মানুষদেরকে আল্লাহর পথ দেখাতেন তাঁদের নামে মানুষদেরকে আল্লাহকে ছেড়ে মানুষের পূজা করতে শেখানো হচ্ছে। পীর-মুরীদী, তাসাউফ ও তরীকতের নামে চলছে কবর পূজা, পীর পূজা। অপরদিকে সমাজের অগণিত পাপের পঙ্কিলতায় লিপ্ত, পুণ্যের আকুলতায় অতৃপ্ত হৃদয়ের মানুষকে তাদের পাপের স্বীকৃতি দিয়ে বুঝানো হচ্ছে, – যাই করো অসুবিধা নেই, যতটুকু পার কর। পীর সাহেব তো আছেনই! ভক্তি কর, মাঝেমধ্যে ধরণা ও হাদিয়া দেও, তাতেই চলবে! পীরের বেলায়াত ও আমল তো রয়েছে, তোমার কিছু কম হলেও অসুবিধা নেই!

এরপরও কিছু মানুষ কুরআন সুন্নাহর কথা চিন্তা করেন। চিন্তা করেন সুন্নাতে নববী ও সাহাবয়ে কেরামের তাসাউফ তরীকত নিয়ে। তাঁদের পথেই চলতে চান তাঁরা। তাঁদের মতোই আল্লাহর বেলায়াত পেয়ে ধন্য হতে চান তাঁরা। এধরনের অনেক মানুষ আমার কাছে মুরীদ হতে আসেন। অনেকেই একটি সংক্ষেপ দিক নির্দেশক বই চান, যে বই অনুসরণ করে তাঁরা চলবেন। আমি বারবার বলেছি, কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করে চলুন। কিন্তু তাঁরা বলেন যে, অগণিত সাধারণ মানুষ কিভাবে কুরআন সুন্নাহ থেকে আমল শিখবে। এজন্যই এই সংক্ষিপ্ত বইটি লেখা হলো। এটিই হলো আমার সকল মুরীদের প্রাথমিক আমল ও ওযীফার বই। একটি বইয়ে সব শেখা বা শেখানো যায় না। আমার মুরীদদেরকে আমি সর্বদা পড়া ও বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জনের জন্য অনুরোধ করছি। বিশেষ করে "এহ্ইয়াউস সুনান" ও "রাহে বেলায়াত" বই দুইটি অবশ্যই পাঠ করবেন, কাছে রাখবেন ও পরিবারের সবাইকে পড়াবেন।

আমি আমার ওয়ালিদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর ও তাঁর মাধ্যমে আমার দাদাজী রাহিমাহুল্লাহু ও অন্যান্য সকল বুজুর্গ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি তার সার সংক্ষেপ হলো কুরআন সুন্নাহর বাইরে কোনো তরীকত, তাসাউফ নেই। ইত্তিবায়ে সুন্নাতের বাইরে কোনো ইবাদত, কামালত বা বুজুর্গী নেই। তরীকত অর্থ শুধুমাত্র কিছু যিকির আযকার বা রিয়াযত নয়। ঈমান আকীদা, আমল ও রিয়াযাতের সমন্বয় হলো তরীকত। আকীদা, তাকওয়া, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত আমল অপরিবর্তনীয়। কিন্তু রিয়াযাত, মুজাহাদা, উপকরণ বা অবলম্বনের পরিবর্তন ঘটে ও ঘটাতে হয়। যুগে যুগে যত তরীকত সৃষ্টি হয়েছে সবই এই রিয়াযাত ও নফল ওযীফার পরিবর্তন হেতু। কারণ নফল ইবাদত ও রিয়াযাতের পদ্ধতির মধ্যে কিছু রয়েছে জায়েয আর কিছু সুন্নাত। অনেক সময় প্রয়োজনের জন্য তরীকতের আমল বা রিয়াযাতের মধ্যে কিছু জায়েয বিষয় রয়ে যায়। এগুলিকে ক্রমান্বয়ে সুন্নাত পদ্ধতিতে উত্তরণ করার চেষ্টা করতে হয়।

আমি আমার পিতা ও পিতামহের কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক আকীদা, তাকওয়া ও আমলকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছি। তাঁদের রেখে যাওয়া দাওয়াত, ইরশাদ ও সংস্কারের কাজ জোরদার করার চেষ্টা করেছি। আর কুরআন সুন্নাহর আলোকে রিয়াযত ও ওযীফার মধ্যে কিছু পরিবর্তন করেছি। তাঁদের শিক্ষার আলোকেই আমাকে এই পরিবর্তন করতে হয়েছে। তাঁরা আমাদের শিখিয়েছেন যে, সুন্নাতের অনুসরণই কামালাতের একমাত্র পথ। তবে কিছু জায়েয বিষয় তারা বিভিন্ন প্রয়োজনে বজায় রেখেছিলেন। আমিও অনেক জায়েয বিষয় বজায় রাখতে বাধ্য হচ্ছি, যদিও সুন্নাতই উত্তম। সাথে সাথে আমি আমার দায়িত্ব ও সাধ্যের মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে জায়েযের পরিবর্তে সুন্নাত পদ্ধতি প্রদানের চেষ্টা করছি। যেন মুরীদগণ বেশি সাওয়াব অর্জন করতে পারেন এবং তাঁদের জন্য কামালাতের পথ আরো সহজ ও নিশ্চিত হয়। এই পুস্তিকাটি সেভাবেই রচনা করিয়েছি। এতে যা কিছু বলা হয়েছে তা আমার মত ও আমার নির্দেশনা জেনে পালন করবেন।

আমার নির্দেশে ও এজাযতে এই পুস্তিকায় এবং "এহ্ইয়াউস সুনান" ও "রাহে বেলায়াত" গ্রন্থদ্বয়ে যা কিছু আমল ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে সবই কুরআন কারীম, সহীহ হাদীস ও সাহাবীগণের আমলের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। এগুলি অবজ্ঞা করে বা অবহেলা করে ঈমান হারা হবেন না। এগুলির উপর আমল করুন এবং সর্বান্তকরণে গ্রহণ করুন। সহীহ সুন্নাত জানার পরে মুমিনের উপর তা মেনে নেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ থাকে না। পালন করতে না পারলে সুন্নাতের মহব্বত ও ইজ্জত করতে হবে এবং স্বীকার করতে হবে যে, বিশেষ কারণে আমি সুন্নাত পালন করতে পারছি না। কিন্তু সুন্নাত জানার পরেও তাকে সমাজের প্রচলন বা কোনো মানুষের অজুহাত দিয়ে অবজ্ঞা করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। সাবধান থাকবেন।

এই পুস্তিকার আমল পরিপূর্ণ আয়ত্ব হয়ে গেলে চেষ্টা করবেন "রাহে বেলায়াত" বইটি থেকে আরো আমল শিখে সেগুলি পালন করতে। আল্লাহর দরবারে দোয়া করি – তিনি যেন এই পুস্তিকার নির্দেশনা মতো ঈমান, ইসলাম ও ইহসানের পথে যারা চলার চেষ্টা করবেন এবং এর ওযীফাগুলি যারা পালন করবেন তাঁদের সকলকে হেফাজত করেন, দুনিয়া ও আখেরাতে সকল কল্যাণ প্রদান করেন ও তরীকতের পথে পরিপূর্ণ উন্নতি, বরকত ও মর্যাদা প্রদান করেন।

আহকারুল এবাদ,
আবুল আনসার সিদ্দিকী
(পীর সাহেব, ফুরফুরা)

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রশংসা মহান আলাহর নিমিত্ত। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয়তম রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর, তাঁর পরিজন ও সহচরগণের উপর।

ফুরফুরার পীর আবুল আনসার সিদ্দিকী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন সুন্নাতের পুনরুজ্জীবনে আপোসহীন সিপাহসালার। ১৪২২ হিজরী (২০০২ খৃ) সালে এহইয়াউস সুনান বইটি প্রকাশের পর তাঁর নির্দেশে রাসূলুলাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের সুন্নাতের আলোকে আমল ও তরীকা বিষয়ক "রাহে বেলায়াত" গ্রন্থটি লেখা হয়। অনেকেই গ্রন্থটি সাদরে গ্রহণ করেন এবং আমল করতে শুরু করেন। কিন্তু তাদের অভিযোগ ছিল যে, বইটি অনেক বড়, একটি সংক্ষেপ বই দরকার। সে চাহিদা সামনে রেখে এ পুস্তিকাটি লেখা হয়।

সমাজে একটি উদ্ভট ও অদ্ভুৎ মানসিকতা আমরা দেখতে পাই। স্বপ্ন, কাশফ, তরীকা বা বুজুর্গের নামে নতুন কোনো কিছু চালু করলে অধিকাংশ মুসলিম তা সহজেই গ্রহণ করেন। অন্তত কেউ আপত্তি করেন না। কিন্তু সহীহ হাদীস নির্ভর মাসনূন আমল-ওযীফার কথা বললে নান অজুহাতে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। উপরন্তু তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এ মানসিকতার মানুষদের কাছে বইটির বক্তব্য গ্রহণযোগ্য করার জন্য তিনি বইয়ের উপরে তাঁর নাম লেখার নির্দেশ দেন। মহান আলাহ সুন্নাতে নববীর পুনরুজ্জীবনে তাঁর সকল প্রচেষ্টা কবুল করে তাকে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন।

২০০৩ সালে বইটি প্রকাশের পর কয়েকবার পুনর্মুদ্রণ করা হয়। ইতোমধ্যে ২০০৭ সালে "সহীহ মাসনূন ওযীফা" প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া এ বইয়ের অধিকাংশ বিষয় অন্যান্য বড় বইয়ের মধ্যে রয়েছে। এজন্য বইটির আর ছাপা হয় নি। কিন্তু অনেকেই বইটি পেতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। বড় বইগুলি পড়া অনেকের জন্য সম্ভব হয় না। এছাড়া সালাত ও আরকানে ইসলাম বিষয়ক কিছু আলোচনা শুধু এ বইয়েই রয়েছে। এজন্য বইটি পুনঃপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নিই। এ সংস্করণে সামান্য কিছু সংশোধন ও পরিমার্জন ছাড়া প্রথম সংস্করণের ভাষা, বক্তব্য বা বিষয়ের তেমন কোনো পরিবর্তন করা হয় নি। মহান আল্লাহ দয়া করে বইটি কবুল করে লেখক, পাঠক ও সকল শুভানুধ্যায়ীকে মাগফিরাত, রহমত, তাওফীক ও কবুলিয়্যাত দান করুন।

আব্দুলাহ জাহাঙ্গীর

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

بسم اله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. وعلى آله وصحبه أجمعين.

বর্তমান সময়ে আমরা অধিকাংশ মানুষ অত্যন্ত কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছি। ইচ্ছা থাকলেও বৃহদাকারের বইপুস্তক কেনা বা পাঠ করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। এজন্য সংক্ষিপ্ত আকারে আরকানে ঈমান, আরকানে ইসলাম, ইহসান, বেলায়াত, সুন্নাত ও ইত্তিবায়ে সুন্নাতের বিবরণ সহ সাধারণ মুসলমানদের পালনযোগ্য মাসনূন ওযীফার সমন্বয়ে এই বইটি লেখা।

"ওযীফা" অর্থ দৈনন্দিন বা নিয়মিত ও নির্ধারিত কর্ম বা কর্মসূচী। এই অর্থে মুমিনের জীবনের ফরয ও নফল সকল নিয়মিত ও নির্ধারিত কর্মই ওযীফা। ঈমান, নামায, রোযা, দান, যাকাত, তিলাওয়াত, দাওয়াত, জনসেবা ইত্যাদি সকল প্রয়োজনীয় কর্ম থেকে মুমিন নিজের জন্য দৈনন্দিন, সাপ্তাহিক, মাসিক বা বাৎসরিক একটি নির্ধারিত কর্মসূচি ও কর্মতালিকা অর্থাৎ ওযীফা তৈরি করে নেবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শিক্ষা ও কর্মের আলোকে এই সামগ্রিক ওযীফার বিভিন্ন দিক আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এই পুস্তিকাটিতে। যেন আগ্রহী মুমিন সহজে এর মধ্য থেকে নিজের "ওযীফা" বা নির্ধারিত কর্মসূচী তৈরি করে নিতে পারেন। প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতার পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কর্তৃক আচরিত প্রাণবন্ত খাঁটি ইবাদত বন্দেগির উপর গুরুত্ব আরোপের চেষ্টা করা হয়েছে।

একদিকে ইসলামের অগণিত অতিপ্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করা, অপরদিকে ইসলামের নামে অগণিত কুসংস্কার বা ভুলেভরা প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতার অসারতা আলোচনা করা এত সংক্ষিপ্ত পরিসরে কখনোই সম্ভব নয়। সংক্ষেপ করার অর্থ অনেক কিছু বাদ দিয়ে অল্প কিছু লেখা। এজন্য অনেক জরুরি বিষয় বাদ দিতে হলো।

পুস্তিকাটিতে শুধুমাত্র সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের উপর নির্ভর করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। হাদীস থেকে ফিকহী মাসআলাহ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইমামগণের কিছু মতভেদ আছে। এগুলি এড়িয়ে শুধুমাত্র হানাফী ফিকহের আলোকে পুস্তিকাটি রচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মাদ, আবু ইউসূফ, সারাখসী, সামারকান্দী, কাসানী, রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ প্রাচীন ইমামগণের প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের উপর নির্ভর করা হয়েছে। যেন পাঠক নিশ্চিত মনে এগুলি পালন করতে পারেন। সমাজে মযহাবের নামে প্রচলিত অনেক ভুল, কুসংস্কার ও অনির্ভরযোগ্য বিষয়, যা মযহাবের ইমামগণ উল্লেখ করেননি বা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে নেই, সেগুলো পরিহার বা প্রতিবাদ করা হয়েছে। কোনো বিষয়ে সন্দেহ হলে অস্থির না হয়ে প্রয়োজনে প্রাচীন গ্রন্থাবলী দেখার চেষ্টা করবেন বা আমাদেরকে প্রশ্ন করবেন।

সংক্ষেপ করার জন্য পুস্তিকায় উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের আরবি লেখা হয়নি, কুরআন-হাদীসের বিস্তারিত দলিলপ্রমাণাদি আলোচনা করা হয়নি এবং আলোচিত সকল হাদীস, মাসআলাহ বা বর্ণনার গ্রন্থনির্দেশনা বা ৎবভবৎবহপব প্রদান করা হয়নি।

পুস্তিকাটি লেখার প্রেরণা, নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান সবই আমার পরম শ্রদ্ধেয় শ্বশুর ফুরফুরার পীর আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহ্হার সিদ্দীকী আল-কুরাইশী সাহেবের। আল্লাহ তাঁকে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করেন, হেফাযত করেন, সুস্থতা ও নেকআমলপূর্ণ দীর্ঘ জীবন প্রদান করেন এবং দেশের অগণিত মানুষকে কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীস অনুসারে ইসলামের সঠিক নির্দেশনা প্রদানের তাওফীক প্রদান করেন।

পাঠকের নিকট বিশেষ আর্জি হলো, এই বইয়ে যে কোনো প্রকার ভুল ধরা পড়লে অবশ্যই তা লেখক বা প্রকাশককে জানাবেন। আল্লাহ আপনাকে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করবেন।

আল্লাহর দরবারে সকাতর আর্জি, পুস্তিকাটি রচনায় আমার যৎসামন্য প্রচেষ্টা তিনি দয়া করে কবুল করেন। একে আমার, আমার পিতামতা, স্ত্রী-সন্তান, উস্তাদ, পরিজন ও সকল পাঠক-পাঠিকার ক্ষমা, বরকত ও নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেন ; আমীন।

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

আরবি উচ্চারণ ও প্রতিবর্ণায়ন বিষয়ক কিছু তথ্য

আরবি সূরা, দোয়া ইত্যাদির বাংলা উচ্চারণ লিখেছি। এগুলি শুধুমাত্র প্রাথমিক, অলস, একেবারে অক্ষম পাঠকদের জন্য। বাংলা উচ্চারণের মাধ্যমে কখনোই বিশুদ্ধভাবে আরবি উচ্চারণ করা যায় না। প্রত্যেক মুমিনের চেষ্টা করতে হবে, বিশুদ্ধ আরবি উচ্চারণ শিখে বিশুদ্ধভাবে সূরা, যিকির ও দোয়াগুলি মুখস্থ করা। আরবি উচ্চারণে বাঙালির দুইটি সমস্যা: ক) আরবি ভাষায় এমন অনেকগুলি বর্ণ বা ধ্বনি আছে যা বাংলা ভাষায় নেই। বাঙালি পাঠক আরবি ধ্বনির নিকটবর্তী বাংলা ধ্বনি দিয়ে আরবি উচ্চারণ করেন। খ) আরবি ও অন্যান্য অনেক ভাষায় দীর্ঘ স্বরধ্বনি আছে। বাংলায় কোনো দীর্ঘ স্বর ধ্বনি নেই। এজন্য স্বর উচ্চারণে বাঙালি ভুল করেন।

প্রথম সমস্যা ও তার সমাধানের প্রচেষ্টা :

(১). আরবিতে (স) বা (ঝ) এর কাছাকাছি তিনট ধ্বনি : (س) (ص) ও (ث)। (س)-এর জন্য আমি সর্বদা (স) ব্যবহার করেছি। (স্কুল), (স্পষ্ট), (ব্যস্ত) ইত্যাদি শব্দের মধ্যে (স)-র যে উচ্চারণ সেই উচ্চারণ করতে হবে। যেমন : (সুব'হা-নালাহ), (সালা-ম)

(ص) ধ্বনি বাংলায় নেই। কোনোভাবেই অনুশীলন ছাড়া বাঙালি এই ধ্বনি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারবেন না। আমি (ص)-এর উচ্চারণের জন্য (স্ব) ব্যবহার করছি। অপারগ পাঠক (স্ব)-কে যথাসম্ভব মোটা (সোয়া)) হিসাবে উচ্চারণ করবেন।

(ث) বাঙালির জন্য অত্যন্ত কঠিন ধ্বনি। জিহ্বাকে দাতের অগ্রভাগের নিচে দাঁত থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে দাঁত ও জিহ্বার মাঝখান দিয়ে বাতাস ছেড়ে দিলে এর উচ্চারণ হয়। এই বর্ণের জন্য আমি (স) ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি।

(২). বাংলায় (জ) ধ্বনির জন্য দুইটি বর্ণ: (জ) ও (য) বাঙালি এই দুইটির মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। আরবিতে এর কাছাকাছি চারিটি ধ্বনি (ج), (ز), (ذ), (ظ)। বাঙালি এই চারিটি ধ্বনিই ভুল উচ্চারণ করেন। আমি (ج)-এর জন্য (জ) ব্যবহার করেছি। এই উচ্চারণ ইংরেজি (ঔ)-এর মতো, কড়া ও শক্ত ভাবে জিহ্বাকে মুখের মাঝখানে উপরের তালুর কাছে নিয়ে উচ্চারণ করতে হবে।

(ز، ذ، ظ) তিনটি ধ্বনির জন্য (য) ব্যবহার করেছি, ইংরাজি (ত)- এর মতো। জিহ্বা দাঁতের কাছে নিয়ে উচ্চারণ করতে হবে। এতে আরবি (ز)-উচ্চারণ ঠিক হবে। বাকি দুইটি ধ্বনির উচ্চারণ অনুশীলন ছাড়া ঠিক করা যায় না।

(৩). বাংলায় (ত) একটি, আরবিতে দুইটি (ت، ط)। আমি দুইটির জন্যই (ত) ব্যবহার করেছি। (ط)-র জন্য (ত্ব) ব্যবহার করেছি, যার উচ্চারণ অনেকটা (তোয়া)।

(৪). বাংলায় (দ) একটি। আরবি (د) বাংলা (দ) এর মতো। এছাড়া (ض) ধ্বনিটিও অনেকটা মোটা (দ)-এর মতো উচ্চারণ করা হয়। আমি (د) এর জন্য (দ) ও (ض) এর জন্য (দ্ব) ব্যবহার করেছি।

(৫). আরবিতে দু'টি (ক)। (ق)-এর জন্য (ক্ব) ব্যবহার করেছি। পাঠক (ক্ব)-কে যথাসম্ভব গলার ভিতর থেকে উচ্চারণ করবেন।

(৬). আরবির কঠিন উচ্চারণগুলির অন্যতম গলার ভিতর থেকে উচ্চারিত ধ্বনিগুলি। যেমন, –(ح، ع، غ) এগুলির জন্য আমি (ح)-এর জন্য ('হ), (ع) এর জন্য 'আ/'ই/ বা 'উ ব্যবাহার করছি। পাঠক যদি দেখেন কোনো বর্ণের পূর্বে উল্টা কমা তাহলে বর্ণটিকে যথাসম্ভব গলার মধ্যে নিয়ে উচ্চারণ করবেন।

দ্বিতীয় সমস্যা ও সমাধানের চেষ্টা :

দীর্ঘ (ই) বুঝাতে (ঈ) বা (ী), দীর্ঘ-উ বুঝাতে (ঊ) অথবা (ূ) এবং দীর্ঘ (আ) বুঝাতে (-) ব্যবহার করেছি। পাঠক এদিকে খুবই খেয়াল রাখবেন। আপনার মাতৃভাষা যেন আরবীর উচ্চারণে বাধা না দেয়। বাংলা দীর্ঘ কারের কোনো উচ্চারণ নেই। কিন্তু আরবি উচ্চারণের সময় অবশ্যই খেলায় রাখবেন। যেমন,– (আল্লা-হ), (সালা-ম) (সুব'হা-ন)উচ্চারণে (-) এর স্থলে অবশ্যই একটু টানবেন। (সুব্বূহুন কুদ্দূসুন) উচ্চারণে (বূ) ও (দূ) এর (উ)-কে দীর্ঘ করতে হবে : (সুব,বুউহুন) (কুদদুউসুন)। (লা- শারীকা লাহু) উচ্চারণের সময় (লা-) এর আ ও (রী)-এর (ই)-কে দীর্ঘায়িত করতে হবে। (শারিইইকা)।

এই জাতীয় আরেকটি সমস্যা হলো 'হসন্ত'। বাংলায় আমরা 'কাল' শব্দটির (ল) ধ্বনি দুইভাবে পড়তে পারি : কাল্ – আজকাল, অথবা কালো – কাল রঙ। আরবি শব্দের বাংলা উচ্চারণ লিখলে বিষয়টি সমস্যা সৃষ্টি করে। মনে রাখতে হবে কোনো অক্ষর আকার, ওকার, ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকলে তা অবশ্যই হসন্ত হবে, হসন্ত দেওয়া থাক বা না থাক। কারণ আরবিতে (অ-কার নেই)। কাজেই (সুব'হা-নাল্লাহ) লেখা থাকলে (সুব্'হা-নাল্লাহ) পড়তে হবে, (ব)-এর নিচে হসন্ত থাক অথবা না থাক।

সর্বাবস্থায় এ সকল প্রচেষ্টা সহায়ক মাত্র। পাঠক যদি আরবি উচ্চারণ না জানেন তাহলে অবশ্যই একজন আরবি জানা মানুষের সাহায্য নিয়ে নিজের উচ্চারণগুলি ঠিক করে নিবেন। একবার ভুল মুখস্থ করলে পরে ঠিক করতে কষ্ট হয়।

রাক'আত তাহাজ্জুদও যিনি আদায় করেন তিনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ যিক্‌রকারী বলে গণ্য হন- ইত্যাদি অগণিত হাদীসের বিস্তারিত আলোচনা আমাদের এ বইয়ের পরিসরে সম্ভব নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণত 'বিতির'-সহ মোট এগার রাক'আত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। কখনো তের রাকআত আদায় করতেন। সুনানে আবূ দাউদের সংকলিত সহীহ হাদীসে আয়েশা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চার রাকআত সালাতুলাহ্‌ই ও তিন রাকআত বিতর মোট সাত রাকআতের কম তাহাজ্জুদ আদায় করতেন না। তিনি অধিকাংশ সময় শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। তিনি তাহাজ্জুদের আগে অনেক সময় কুর'আনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করতেন। কখনো কিছু তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি যিক্‌র করার পর তাহাজ্জুদ শুরু করতেন। তিনি তাহাজ্জুদের নামাযের তিলাওয়াত খুব লম্বা করতেন। এক রাক'আতে অনেক সময় ৪/৫ পারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন। রুকু ও সাজদাও অনুরূপভাবে দীর্ঘ করতেন। যতক্ষণ তিনি তিলাওয়াত করতেন প্রায় ততক্ষণ রুকুতে ও সাজদায় থাকতেন। আর তিলাওয়াতের সময় তিনি কুরআনের আয়াতের অর্থ অনুসারে থেমে থেমে দোয়া করতেন। তাহাজ্জুদের নামাযের মধ্যে তিনি ক্রন্দন করতেন। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদ আদায় করার কারণে অনেক সময় তাঁর মুবারক পদযুগল ফুলে যেত।

প্রত্যেক মুমিনের উচিত তাহাজ্জুদ পালনে সচেষ্ট হওয়া। শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায়ে অসুবিধা হলে, ঘুমাতে যাওয়ার আগে সাধ্যমত ২/৪/৮ রাক'আত সালাত আদায় করে এরপর বিতর আদায় করবেন। এরপর মনের আবেগ ও ভালবাসা দিয়ে আল্লাহর কাছে সারাদিনের নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, নিজের, বন্ধুদের ও শত্রুদের পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে, সমস্যাদির জন্য সাহায্য চেয়ে এবং তাঁর সার্বিক রহমত ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করে ঘুমাতে যাবেন। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করেন।

রমযান মাসের কিয়ামুল লাইল বা তারাবীহ

এভাবে আমরা দেখছি যে, রাতের সালাত, অর্থাৎ কিয়ামুল লাইল বা সালাতুল লাইল বা তাহাজ্জুদ সারা বৎসর নিয়মিত পালন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। রমযান মাসে রাতের সালাতের গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। রমযান মাসের কিয়ামুল্লাইল সাধারণত "তারাবীহ" নামে পরিচিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন হাদীসে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন রমযানে এ সালাত আদায়ের জন্য। তিনি সাধারণত সারা বৎসরই মাঝরাতে বা শেষ রাতে এ সালাত আদায় করতেন। অনেক সাহাবী প্রথম রাতেই ইশার সালাতের পরে তা আদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসে ৩/৪ দিন জামাতে এ সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি ফরয হয়ে যাওয়ার ভয়ে জামাত বন্ধ করে দেন এবং একাকী আদায়ের নির্দেশ দেন।

তাঁর ইন্তেকালের পরে আবু বকর (রা) প্রায় দুই বৎসর খলিফা ছিলেন। এরপর উমর (রা) খলিফা হন। তিনি দেখেন যে, অনেকে ইশার সালাতের পরেই একাকী বা ছোট জামাতে কিয়ামুলাইল পালন করেন। উমর (রা) শেষ রাতে কিয়ামুল্লাইল আদায় করা বেশী ভালবাসতেন। তবুও যারা প্রথম রাতেই কিয়ামুল্লাইল আদায় করতেন তাঁদের জন্য তিনি দুইজন কারী (হাফিজ) ইমাম ঠিক করে দেন: একজন পুরুষদেরকে এবং অন্যজন মেয়েদেরকে জামাতে কিয়ামুল্লাইল পড়াতেন। তাঁরা দীর্ঘ কিরা'আত দিয়ে তারাবীহ আদায় করতেন। তাঁদের জামাত ইশার পরে শুরু হলেও শেষ হতে প্রায় ভোর হয়ে যেত। তারাবীহ শেষ করে কোন রকমে সাহরী খাওয়ার সুযোগ থাকত।

তাঁরা বিতর সহ ১১ বা ২৩ রাক'আত কিয়ামুল্লাইল (তারাবীহ) আদায় করতেন। পরবর্তী কালে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের মধ্যে ২৩ রাক'আত কিয়ামুল্লাইল পালনের প্রচলন ছিল। কিয়ামুল্লাইল বা তারাবীহর সালাতের মধ্যে পূর্ণ কুরআন কারীম একাধিকবার বা অন্তত একবার খতম করা তাঁরা পছন্দ করতেন। যেহেতু দীর্ঘ কিরা'আত পড়া হতো এজন্য ৪ রাক'আত পরে বেশ অনেকক্ষণ বিশ্রাম করতেন। এজন্য পরবর্তী যুগে এই সালাত "তারাবীহ" বা বিশ্রামের সালাত হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[৮৯]

প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব রমযান মাসে তারাবীহ আদায়ে সচেষ্ট হওয়া। যথাসম্ভব জামাতের সাথে কুরআন খতম করে তারাবীহ আদায় করতে হবে।

সালাতুত তারাবীহ বিষয়ক কিছু প্রয়োজনীয় কথা

(১). এক বা একাধিক সূরা বারাবার পাঠ করে তারাবীহ আদায় করা যায়। তবে কুরআন খতম উত্তম। কুরআন তিলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী সমান সাওয়াব পাবেন। তবে শর্ত হলো উপরে বর্ণিত সুন্নাত পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে আদব ও তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করতে হবে। অনেকে দ্রুত তিলাওয়াত করে তাড়াতাড়ি সালাত শেষ করা পছন্দ করেন। এতে সাওয়াবের চেয়ে গোনাহ অর্জনের ভয় বেশি। দ্রুত পাঠ করলে কুরআনের অনেক অংশই শোনা হয় না, বেয়াদবী হয়, উপরন্তু সালাত নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে। এইরূপ খতম তারাবীহের চেয়ে সূরা তারাবীহ উত্তম হবে।

(২). প্রতি চার রাক'আত সালাতের পরে বিশ্রাম করা হয়। এ বিশ্রাম ইবাদতের অংশ নয় বা কোন সাওয়াবের কাজ নয়। শুধুমাত্র ক্লান্তি দূর করার জন্যই এ বিশ্রাম। কোন রকম বিশ্রাম ছাড়া তারাবীহ আদায় করলেও কোন প্রকার অসুবিধা নেই।

---

[৮৯] মুসান্নাফু ইবনি আবী শাইবা ২/৩৪, ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৪/২৫৩, শারহুয যারকানী ১/৩৪১, সুয়ূতী, তানবীরুল হাওয়ালিক ১/১০৫, ইবনু সা'দ, তাবাকাত ৩/২৮১, তারীখুত তাবারী ২/৫৭০।

(৩). এ বিশ্রামের সময় কোন নির্ধারিত যিক্‌র বা দোয়া নেই। আগের যুগের মানুষেরা এই সময়ে একাকী ২/৪ রাক'আত নামায পড়ে নিতেন। অথবা একটু হাঁটাচলা করে নিতেন। আমাদের দেশে "সুবহানাযিল মুলকি..." বলে একটি দোয়া এই সময় পাঠ করা হয়। অনেকে প্রতি চার রাক'আত পরে, অনেকে একেবারে শেষে "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল জান্নাতা..." বলে একটি মুনাজাত পাঠ করেন। এই দোয়া ও মুনাজাতে কোন দোষ নেই। তবে তারাবীহের এই বিশ্রামের সময় এই দোয়া ও মুনাজাত পাঠ করার কোন সুন্নাত ভিত্তি নেই বা পাঠ না করলেও কোন দোষ হবে না। বরং এর পরিবর্তে দরুদ শরীফ পাঠ করা উত্তম। সাধারণ যে কোন তাসবীহ তাহলীল পাঠ করতে পারেন। চুপ করে বসে থাকলেও কোন অসুবিধা নেই। এগুলির সাথে তারাবীহের কোন মাসনূন সম্পর্ক নেই।

(৪). তারাবীহের রাকআত নিয়ে ঝগড়া বা বিদ্বেষ অত্যন্ত দুঃখজনক ও কঠিন কবীরা গোনাহ। ২০ রাকআত তারাবীহকে বিদআত বলা, এতে আপত্তি করা অথবা ২০ রাকআতের কম পড়লে বিদ্বেষ বা ঝগড়া করা উভয়ই একইরূপ অপরাধ। হাদীস ও সালফে সালেহীন ফকীহগণের মতামত সম্পর্কে অজ্ঞতাই এর মূল কারণ। রাসূলুল্লাহ ১১ বা ১৩ রাক'আত কিয়ামুল্লাইল আদায় করতেন বলে সহীহ হাদীসে প্রমাণিত। তিনি সারা বৎসর মাঝ রাতে বা শেষ রাতে দীর্ঘ সূরা দিয়ে প্রায় ৩/৪ ঘন্টা ধরে তা আদায় করতেন। শুধু রমযানে অর্ধ ঘন্টায় আট রাকআত আদায় করলে সুন্নাত পালিত হবে বলে ধারণা করা সঠিক নয়।

(৫). ২০ রাকআত তারাবীহ জামাতে আদায় করা হলে অনেকে অনেকে ৮ রাক'আত তারাবীহ আদায় করে চলে যান। আমরা চিন্তা করি এইটুকু পড়লেই তো সুন্নাত হয়ে গেল বা গোনাহ থেকে বাঁচা গেল। অথচ আমাদের চিন্তা করা উচিত ছিল কি করলে বেশী সাওয়াব হবে। আমরা পার্থিব অল্প কয়েকটি টাকা, নম্বর বা স্বার্থের জন্য কত কষ্ট করি। অথচ আল্লাহর সাওয়াবের বিষয়ে আমাদের কত অনীহা। তখন চিন্তা করি কত কম করলে চলে! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত কিয়ামুলাইল আদায় করবে আল্লাহ তাঁকে সারারাত সালাত আদায়ের সাওয়াব দান করবেন।[৯০]

সালাতুদ দোহা (চাশত ও ইশরাকের নামায)

সূর্য উদয়ের সময় নামায আদায় করা নিষিদ্ধ। সূর্য পরিপূর্ণ রূপে উদিত হওয়ার পরে, অর্থাৎ সূর্যোদয়ের মুহূর্ত থেকে প্রায় ২৫ মিনিট পরে দোহা বা চাশ্‌তের নামাযের সময় শুরু। এই সময় থেকে শুরু করে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যে কোনো সময়ে এই নামায আদায় করা যায়। দোহার নামায দুই রাক'আত থেকে বার রাক'আত পর্যন্ত আদায় করা যায়। তাহাজ্জুদ নামাযের পরে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাসনূন নফল নামায হলো দোহার নামায। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে এই নামাযকে 'আওয়াবীনের নামায' বা 'আল্লাহওয়ালাগণের নামায' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আমাদের দেশে এই নামায 'ইশরাকের নামায' বা 'সূর্যোদয়ের নামায' বলে পরিচিত। অনেকে সূর্যোদয়ের পরের নামাযকে 'ইশরাকের নামায' এবং পরবর্তী সময়ের নামাযকে 'দোহা বা চাশ্‌তের নামায' বলেন। হাদীস শরীফে 'সালাতুদ দোহা' বা 'দোহার নামায' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে ; "ইশরাকের নামায" শব্দটি হাদীসে পাওয়া যায় না। এছাড়া হাদীসে ইশরাক ও দোহার মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করা হয়নি। সূর্যোদয় থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময় নফল নামায আদায় করলে তা 'সালাতুদ দোহা' বা দোহার নামায বলে গণ্য হবে।

সবচেয়ে উত্তম হলো ফজরের সালাত জামাতে আদায় করে যিক্‌র ওযীফায় রত থাকা এবং সূর্যোদয়ের পরে সালাতুদ দোহা আদায় করে মসজিদ থেকে বের হওয়া। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা'আতে আদায় করে বসে বসে আল্লাহর যিক্‌র করবে সূর্যোদয় পর্যন্ত, এরপর দুই রাক'আত নামায আদায় করবে, সে একটি হজ্ব ও একটি ওমরার সাওয়াব অর্জন করবে: পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ (হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব অর্জন করবে।)"।[৯১] মহিলারা ঘরের মধ্যে সালাতের স্থানে বসে এই হাদীস পালন করলে ইনশা আল্লাহ এই সাওয়াব পাবেন।

এভাবে অপেক্ষা সম্ভব না হলেও সকল মুমিনের উচিত কর্মব্যস্ততার ফাঁকে কয়েক মিনিট সময় নিয়ে দোহার সালাত আদায় করা। এই সালাতের ফযীলতে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এই সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় হয়, অগণিত সাওয়াব ও গনীমত লাভ হয়, আল্লাহর নৈকট্যের মর্যাদা পাওয়া যায়, আল্লাহ সারাদিন হেফাযত করেন ইত্যাদি বিভিন্ন মর্যাদা ও সাওয়াবের সুসংবাদ আমরা পাই।[৯২]

মাগরিব ও ইশার সালাতের মধ্যবর্তী নফল সালাত

মাগরীব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ বেশিবেশি নফল সালাত আদায় করতে ভালবাসতেন। আমাদের সকলেরই চেষ্টা করা উচিত এই সময়ে সুযোগমত কিছু নফল সালাত আদায় করা।

সালাতুত তাসবীহ

রাসূলুলাহ ﷺ তাঁর চাচা আব্বাস (রা)-কে বলেন: "চাচাজি, আমি আপনাকে একটি বিশেষ উপহার ও বিশেষ অনুদান প্রদান করব, যা পালন করলে আল্লাহ আপনার ছোট, বড়, ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, প্রকাশ্য, গোপন সকল গোনাহ ক্ষমা করবেন। – তা হলো এই

---

[৯০] তিরমিযী ৩/১৬৯, নাসাঈ ৩/২০২, ইবনু মাজাহ ১/৪২০, ইবনু খুযাইমা ৩/৩৩৭, ইবনু হিব্বান ৬/২৮৮।

[৯১] তিরমিযী ২/৪৮১, নং ৫৮৬, সহীহুত তারগীব ১/২৬০, ২৬১।

[৯২] বিস্তারিত দেখুন, লেখকের বই রাহে বেলায়াত, ২৪৫-২৪৮।

যে, আপনি চার রাক'আত নামায আদায় করবেন। প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য যে কোনো একটি সূরা পাঠ করবেন। প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য যে কোনো সূরা পাঠের পর দাঁড়ানো অবস্থায় ১৫ বার বলবেন :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণ: 'সুব'হা-নাল্লাহ, ওয়াল'হামদুলিল্লাহ, ওয়ালা- ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়া আল্লা-হু আকবার।' **অর্থ:** "আল্লাহ পবিত্র, এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর, এবং নেই কোন মা'বুদ আল্লাহ ছাড়া, এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।"

এরপর রুকুতে যেয়ে রুকু অবস্থায় উপরের যিক্‌রগুলি ১০ বার, রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় ১০ বার, সাজদায় ১০ বার, প্রথম সাজদা থেকে উঠে বসা অবস্থায় ১০ বার, দ্বিতীয় সাজদায় ১০ বার এবং দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে (বসা অবস্থায়) ১০ বার। মোট এক রাক'আতে ৭৫ বার (চার রাক'আতে মোট ৩০০ বার)। সম্ভব হলে আপনি প্রতিদিন একবার, না হলে প্রতি সপ্তাহে একবার, না হলে প্রতি মাসে একবার, না হলে প্রতি বৎসর একবার, না হলে অন্তত সারা জীবনে একবার এ নামায আপনি আদায় করবেন।"

"সালাতুস তাসবীহ" সংক্রান্ত অধিকাংশ হাদীসই অত্যন্ত যয়ীফ বা দুর্বল সনদে বর্ণিত। একমাত্র এ হাদীসটিকে কোনো কোনো মুহাদ্দিস সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হিসাবে গণ্য করেছেন।[৯৩]

ইমাম তিরমিযী প্রখ্যাত তাবে-তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারাক (মৃত্যু ১৮১ হি) থেকে "সালাতুত তাসবীহ" আদায়ের আরেকটি নিয়ম উল্লেখ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারকের মতে এ অতিরিক্ত যিক্‌র আদায়ের নিয়ম হলো: নামায শুরু করে শুরুর দোয়া বা সানা পাঠের পরে ১৫ বার, সূরা ফাতেহা ও অন্য কোনো সূরা শেষ করার পরে ১০ বার, রুকুতে ১০ বার, রুকু থেকে উঠে ১০ বার, প্রথম সাজদায় ১০ বার, দুই সাজাদার মাঝে ১০ বার ও দ্বিতীয় সাজদায় ১০ বার মোট ৭৫ বার প্রতি রাক'আতে।

অর্থাৎ, এই নিয়মে কিরাআতের পূর্বে ও পরে দাঁড়ানো অবস্থায় ২৫ বার তাসবীহ পাঠ করা হয় আর দ্বিতীয় সাজাদার পরে বসা অবস্থায় কোনো তাসবীহ পড়া হয় না। পূর্বের হাদীসে বর্ণিত নিয়মে কিরাআতের পূর্বে কোনো তাসবীহ নেই। দাঁড়ানো অবস্থায় শুধু কিরাআতের পরে ১৫ বার তাসবীহ পড়তে হবে। প্রত্যেক রাক'আতে দ্বিতীয় সাজদার পরে বসে ১০ বার তাসবীহ পড়তে হবে।

আব্দুলাহ ইবনু মুবারক বলেন, যদি এ সালাত রাত্রে আদায় করে তাহলে দু রাক'আত শেষে সালাম ফিরিয়ে আবার দু রাক'আত পৃথকভাবে আদায় করবে। "সালাতুত তাসবীহ" আদায়ের সময় রুকু ও সাজদায় প্রথমে রুকু ও সাজদার মাসনূন তাসবীহ 'সুবহানার রাব্বিয়্যাল আযীম' ও 'সুবহানা রাব্বিয়্যাল আ'লা' নূন্যতম তিন বার করে পাঠ করার পরে অতিরিক্ত তাসবীহগুলি পাঠ করতে হবে।[৯৪]

সালাতুত তাওবা

রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন, "যে কোনো বান্দা যদি কোনো গোনাহের কর্ম করে সাথে সাথে সুন্দর করে ওযু করে দুই রাক'আত নামায আদায় করে, এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তাহলে আল্লাহ তাঁকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন।"[৯৫]

সালাতুল ইস্তিখারা

ইস্তিখারার অর্থ হলো কারো কাছে সঠিক বিষয় বেছে দেওয়ার প্রার্থনা করা। যে ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা একাধিক বিষয়ের মধ্য থেকে একটি বেছে নেওয়ার অবকাশ আছে সেখানে আল্লাহর সাথে পরামর্শ না করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মুমিনের উচিত নয়। ছোট, বড়, গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুত্বহীন সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আল্লাহর সাথে পরামর্শ করা, অর্থাৎ তাঁর মহান দরবারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফীক চাওয়া মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। জাবির (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে সকল বিষয়ে 'ইস্তিখারা' করতে শিক্ষা দিতেন, যেমন গুরুত্বের সাথে তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন : যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজের ব্যাপারে মনের মধ্যে চিন্তা করবে তখন ফরয নয় এরূপ (নফল)দুই রাক'আত নামায আদায় করবে অতঃপর বলবে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ [يسمي حاجته] خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي [أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ] فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. [اللهم] وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي [أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ]فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ

উচ্চারণ : আলা-হুম্মা, ইন্নী আসতাখীরুকা বি'ইলমিকা, ওয়া আসতাক্বদিরুকা বিক্বুদরাতিকা, ওয়া আসআলুকা মিন ফাদ্বলিকাল 'আযীম। ফাইন্নাকা তাক্বদিরু, ওয়ালা- আক্বদিরু, ওয়া তা'অলামু ওয়ালা- আ'অলামু, ওয়া আনতা 'আলা-মুল গুইউব। আলা-হুম্মা, ইন কুনতা তা'অলামু আন্না হা-যাল আমরা (উদ্দিষ্ট বিষয়ের নাম বলবে) খাইরুল লী ফী দীনী ওয়ামা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী ফাক্বদুরহু লী,

---

[৯৩] সুনানুত তিরমিযী ২/৩৪৭-৩৫০, নং ৪৮১, সুনানু আবী দাউদ ২/২৯, নং ১২৯৭, সুনানু ইবনি মাজাহ ১/৪৪২, নং ১৩৮৬, ১৩৮৭, মুসতাদরাক হাকিম ১/৪৬৩-৪৬৪, সহীহ ইবনু খুযাইমা ২/২৩-২৪, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/২৮১-২৮৩, সহীহুত তারগীব ১/৩৫৩-৩৫৫।

[৯৪] সুনানুত তিরিমিযী ২/৩৪৭।

[৯৫] সুনানুত তিরমিযী ২/২৫৭, নং ৪০৬, ৫/২২৮, নং ৩০০৬, সুনানু আবী দাউদ ২/৮৬, নং ১৫২১, সহীহ ইবনু হিব্বান ২/৩৯০, সহীহ ইবনু খুযাইমা ২/২১৬, সহীহু সুনানি আবী দাউদ ১/২৮৩।

ওয়া ইয়াসসিরহু লী, সুম্মা বা-রিক লী ফীহি। আলা-হুম্মা, ওয়া ইন কুনতা তা'অলামু আন্না হা-যাল আমরা শাররুল লী ফী দীনী ওয়ামা'আ-শী ওয়া 'আ-কিবাতি আমরী ফাস্বরিফহু 'আন্নী, ওয়াস্বরিফনী 'আনহু ওয়াক্ব দুর লিয়াল খাইরা হাইসু কা-না, সুম্মা আরদ্বিনী বিহী।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনি আপনার জ্ঞান থেকে আমার জন্য সঠিক বিষয় নির্বাচন করবেন, আমি আপনার নিকট ক্ষমতা চাই আপনার ক্ষমতা থেকে এবং আমি আপনার নিকট চাই আপনার মহান করুণা ও বরকত থেকে। কারণ আপনি ক্ষমতাবান আর আমি অক্ষম, আপনি জানেন আর আমি জানি না, আর আপনি সকল গাইবের মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ, যদি আপনি জানেন যে, এই বিষয়টি (নির্দিষ্ট বিষয়টির উল্লেখ করবে) কল্যাণ ও মঙ্গলময় আমার জন্য, আমার ধর্ম, আমার পার্থিব জীবন এবং আমার পরিণতির জন্য (অথবা বলেন : আমার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী পরিণতির জন্য), তাহলে আপনি একে আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন, সহজ করে দিন এবং আমার জন্য এতে বরকত প্রদান করুন। হে আল্লাহ, আর আপনি যদি জানেন যে, এই কর্মটি অমঙ্গলকর বা অকল্যাণকর আমার জন্য, আমার ধর্ম, জাগতিক জীবন ও আমার ভবিষ্যৎ পরিণতির জন্য (অথবা তিনি বলেন : আমার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী পরিণতির জন্য) তাহলে একে আমার নিকট থেকে সরিয়ে নিন এবং আমাকে এর নিকট থেকে সরিয়ে নিন। আর যেখানেই কল্যাণ ও মঙ্গল থাকুক তাকে আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন এবং আমাকে তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দিন।"[৯৬]

অন্যান্য সুন্নাত-নফল সালাত

হাদীসে যোহরের পরে চার রাক'আত, আসরের পূর্বে চার রাক'আত, ইশার পূর্বে চার রাক'আত ও অন্যান্য নফল সালাতের বিশেষ সাওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সাধারণভাবে সুযোগ ও সাধ্যমত নিষিদ্ধ সময় ছাড়া অন্য যে কোন সময়ে বেশিবেশি নফল সালাত আদায়ের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত জামতে আদায় করতে হবে

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত অবশ্যই জামাতবদ্ধভাবে আদায় করতে হবে। মুসলিম উম্মাহ একমত যে ফরয সালাত জামাতে আদায় করা জরুরী ও ওযর ছাড়া জামাত পরিত্যাগ করে একাকী সালাত আদায়কারী গোনাহগার হবেন। তবে এই গুরুত্ব বুঝানোর জন্য তাঁদের ফিকহী পরিভাষা বিভিন্ন প্রকারের। "বাদাইউস সানাইয়" ও হানাফী মাযহাবের অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে জামাতে নামাযকে ওয়াজিবই লিখা হয়েছে। পরবর্তী কোনো কোনো গ্রন্থে সুন্নাত লিখা হলেও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা ওয়াজিবের পর্যায়ের।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এবং সাহাবীগণ কখনোই কঠিন ওযর ছাড়া জামা'আত ত্যাগ করেননি। জামা'আতে অনুপস্থিত থাকাকে তাঁরা নিশ্চিত মুনাফিকের পরিচয় বলে জানতেন। অন্ধ ও পরিচালকহীন ব্যক্তিকেও তিনি জামাত ছেড়ে একাকী ঘরে ফরয সালাত আদায়ের অনুমতি দেন নি। বরং বলেছেন: "আযান শুনলে হামাগুড়ি দিয়ে বা বুকে ছেঁচড়ে হলেও মসজিদে এসে তোমাকে জামাতে নামায পড়তে হবে।" যারা জামাতে নামাযে শরীক হয় না, তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি নামাযের আহ্বান (আযান) শুনতে পেল কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিয়ে জামাতে এলো না, তার নামাযই হবে না। তবে যদি ওযর থাকে তাহলে হতে পারে। ওযর হলো ভয় ও অসুস্থতা।"

ইবনু মাস'উদ (রা) বলেন: "যার ভালো লাগে যে, সে আগামীকাল মুসলিম হিসাবে আল্লহার সাথে দেখা করবে, সে যেন এই নামাযগুলিকে যে মসজিদে আযান দেওয়া হয় সেখানে নিয়মিত জামাতে আদায় করে। কারণ আল্লাহ তোমাদের নবীর জন্য হেদায়েতের সুন্নাত প্রচলন করেছেন। আর এসকল হেদায়েতের সুন্নাতের মধ্যে অন্যতম হলো নামাযগুলিকে মসজিদে জামাতে আদায় করা। তোমরা যদি বাড়িতে নামায পড় তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর (ﷺ) সুন্নাত ছেড়ে দেবে। আর তোমাদের নবীর সুন্নাত ছেড়ে দিলে তোমরা গোমরাহ হয়ে যাবে। ... আমাদের সময়ে আমরা দেখেছি একমাত্র সুপরিচিত মুনাফিক ছাড়া কেউই জামাতে অনুপস্থিত থাকতেন না।.."

জামাতে নামায ত্যাগ করা যেমন ভয়ঙ্কর অপরাধ ও গোনাহের কাজ, তেমনি জামাতে নামায আদায় অপরিমেয় সাওয়াব ও বরকতের কাজ। জামাতে নামায আদায় করলে আল্লাহ ২৭ গুণ বেশি সাওয়াব দান করবেন, যারা সর্বদা জামাতে নামায আদায়ের জন্য মসজিদের দিকে মন দিয়ে রাখেন তাঁদেরকে আল্লাহ কেয়ামতের দিন আল্লাহর প্রিয়তম বান্দাদের সাথে আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, জামাতের অপেক্ষা করা জিহাদের সমতুল্য, ইত্যাদি বিভিন্ন মর্যাদার কথা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন ইমামের সাথে প্রথম তাকবীরসহ পরিপূর্ণ নামায জামাতে আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহ দুটি মুক্তি লিখে দিবেন: ১. জাহান্নাম থেকে মুক্তি ; ও ২. মুনাফিকী থেকে মুক্তি।"[৯৭]

ফজরের নামাযের জামা'আতের অতিরিক্ত গুরুত্ব ও ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কষ্টের নামায হলো ফজর ও ইশা'র জামা'আত। ফজর ও ইশা'র নামায জামাতে আদায় করলে কত ফযীলত তা যদি তারা বুঝত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা এই দুই নামাযে উপস্থিত হতো।" "যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতে আদায় করবে, সে আল্লাহর জিম্মাদারীর মধ্যে প্রবেশ করবে।" "যে ব্যক্তি ইশা'র নামায জামাতে আদায় করবে সে যেন অর্ধেক রাত্র (তাহাজ্জুদের) আদায় করল (সে অর্ধ রাত্র তাহাজ্জুদের নামায পড়ার সাওয়াব পাবে)। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাযও জামাতে আদায় করবে সে

[৯৬] সহীহ বুখারী ১/৩৯১, ৫/২৩৪৫, ৬/২৬৯০, নং ১১০৯, ৬০১৯, ৬৯৫৫, ফাতহুল বারী ১১/১৮৩-১৮৭।
[৯৭] সুনানুত তিরমিযী ২/৭, নং ২৪১, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/২১৮, সহীহুত তারগীব ১/২৩৭।

ব্যক্তি যেন সারা রাত (তাহাজ্জুদের) নামায আদায় করল (অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইশা ও ফজর জামাতে আদায় করবে, সেই ব্যক্তি সারা রাত তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের সাওয়াব অর্জন করবে)।"

জামাতে সালাত আদায়ের কিছু প্রয়োজনীয় বিধান

১. মসজিদে প্রবেশ করে বসার আগে 'দুখুলুল মাসজিদ' বা 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' নামায আদায় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করে বসার আগে অন্তত দু রাক'আত নামায পড়তে বলেছেন। মাকরুহ ওয়াক্ত ছাড়া অন্য যে কোন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে কোন না কোন সালাত আদায় না করে বসবেন না। যদি সুন্নাতে মু'আক্কাদা সালাত যিম্মায় থাকে তাহলে মসজিদে প্রবেশ করে তা আদায় করে বসুন। নইলে, দু রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ সুন্নাত নামায আদায় করতে হবে। সরাসরি জামাতে দাঁড়িয়ে গেলেও তাহিয়্যাতুল মসজিদের সুন্নাত আদায় হবে। কোনো নামায না পড়ে মসজিদে বসে গেলে এই সুন্নাত পালনের সাওয়াব থেকে আমরা বঞ্চিত হব।

২. মসজিদে প্রবেশ করার পর আগের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও পিছনের কাতারে দাঁড়ানো গোনাহের কাজ। যথাসম্ভব ধীর স্থিরভাবে আগের কাতারে দাঁড়াতে হবে। এতে ইমাম এক রাক'আত শেষ করে ফেললে কোনো ক্ষতি নেই। আমরা মসজিদে রাক'আত গণনা করতে যাই না, সাওয়াব অর্জন করতে যাই। তাড়াহুড়ো করলে, পিছনের কাতারে দাঁড়ালে গোনাহ হবে। শান্তভাবে আগের কাতারে দাঁড়ালে সাওয়াব বেশি হবে।

৩. নামাযের কাতারে যথাসম্ভব গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়াতে, মাঝের ফাঁক বন্ধ করতে ও কাতার সোজা করতে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি ইকামতের পরে মুক্তাদীগণকে কাতার সোজা করার ও কাতারের মাঝের ফাঁক বন্ধ করার নির্দেশ দিতেন এবং তা পালিত হয়েছে কিনা পরীক্ষা করতেন। এরপর সালাত শুরু করতেন।

৪. জামাতে সালাত আদায়ের সময় মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করবেন এবং ইমামের পিছে পিছে সালাত আদায় করবেন। কোন অবস্থাতেই ইমামের আগে সালাতের কোন কর্ম করা যায়েয নয়। কোন কোন মুসাল্লী ইমামের আগেই রুকুতে চলে যান, ইমামের আগেই সাজদা করেন বা ইমামের আগেই রুকু সাজদা থেকে উঠে পড়েন। এগুলো কঠিন অন্যায় এবং অনেক সময় সালাত নষ্ট হওয়ার কারণ। রাসুলুলাহ (ﷺ) এ ধরণের কর্ম থেকে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি ইমামের আগেই রুকু বা সিজদা থেকে মাথা উঠায় তার কি ভয় হয়না যে আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথার মত বানিয়ে দেবেন, অথবা তার আকৃতি গাধার মত করে দেবেন?!"[৯৮]

বারা ইবনে আযিব (রা.) বলেছেন : "আমরা রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর পিছে সালাত আদায় করতাম। তিনি যখন "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলে রুকু থেকে উঠতেন তখন আমরাও উঠে দাঁড়াতাম এবং রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর কপাল মাটি স্পর্শ করার আগে আমাদের কেউ তার পিঠ বাঁকাত না। এরপর আমরা সবাই সিজদা করতাম।"[৯৯]

৫. জামাতে সালাত আদায় করলে মুক্তাদীকে ইমামের পিছে পিছে সালাতের তাকবীরগুলি বলতে হবে। অর্থাৎ তাহরীমা, রুকু, সাজদা ইত্যাদির জন্য মুক্তাদীও "আল্লাহু আকবার" বলবেন। তবে রুকু থেকে উঠার সময় ইমাম যখন (সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ) বলবেন তখন মুক্তাদী বলবেন "রাব্বানা লাকাল হামদু..."।

৬. জামাতে গমন করার সময় তাড়াহুড়ো করা হাদীসে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, নামাযের ইকামত হওয়ার পরেও যদি তোমরা মসজিদে যাও তাহলে মানসিক অস্থিরতা বা দৌড়াদৌড়ি করে মসজিদে যাবে না। শান্তভাবে ও ধীরে ধীরে যাবে। যতটুকু নামায ইমামের সাথে পাবে তা আদায় করবে, বাকিটা পরে নিজে আদায় করবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, ঘর থেকে নামাযের জন্য বাহির হওয়ার সময় থেকেই মুসল্লী নামাযের মধ্যেই থাকেন এবং আল্লাহর কাছে তিনি নামাযরত বলে গণ্য হন। যদি কেউ মসজিদে যেয়ে দেখেন যে পুরো জামাত শেষ হয়ে গিয়েছে তাহলেও তিনি জামাতের সাওয়াব পাবেন।

৭. মুক্তাদী যদি কোন রাক'আতের রুকুতে ইমামের সাথে শরীক হতে পারেন তাহলে তিনি সেই রাক'আত জামাতে আদায় করতে পেরেছেন বলে গণ্য করা হবে। মসজিদে প্রবেশ করে যদি দেখেন যে, ইমাম রুকু রত অবস্থায় আছেন, তাহলে তাড়াহুড়ো করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ লঙ্ঘনের গোনাহে লিপ্ত হবেন না। আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর নিকট সাওয়াব লাভ, রাক'আতের সংখ্যা গণনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যথাসম্ভব শান্তভাবে আগের কাতারে জায়গা দেখে সেখানে দাঁড়ান। দাঁড়ানো অবস্থায় পূর্ণভাবে তাকবীরে তাহরীমা (আল্লাহু আকবার) বলুন। এরপর দ্বিতীয়বার আল্লাহু আকবার বলতে বলতে রুকু করুন। এভাবে রুকু করে যদি ইমামের উঠে পড়ার বা (সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ) বলার পূর্বে একবারও তাসবীহ বলতে পারেন তাহলে সেই রাক'আত আপনি জামাতের পেয়েছেন বলে গণ্য করবেন।

৮. অনেকে ইমাম রুকু থেকে উঠে পড়লে বা সাজদা করলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন। ইমাম পরবর্তী রাক'আত শুরু করলে জামাতে শরীক হন। এতে তিনি অগণিত সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হন। ইমামকে যে অবস্থায় পাওয়া যাবে সেই অবস্থায় তাঁর পিছনে ইকতিদা করতে হবে বা সালাত শুরু করতে হবে। আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ইবাদত তাঁর জন্য সাজদা করা। কাজেই ইমামকে সাজদায় রত

---

[৯৮] সহীহ বুখারী ১/২৪৫, সহীহ মুসলিম ১/৩২০।
[৯৯] সহীহ বুখারী ১/২৮০, সহীহ মুসলিম ১/৩৪৫।

পেলে সাথে সাথে দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বলে দ্বিতীয় তাকবীর বলে সাজদায় ইমামের সাথে শরীক হতে হবে। উদ্দেশ্য সাওয়াব অর্জন। রাক'আত গণনা উদ্দেশ্য নয়।

৯. যে ব্যক্তি ইমামের সাথে পুরো সালাত আদায় করতে পারেন না, প্রথমে দুই/এক রাক'আত বাদ পড়ে তাকে "মাসবূক" বলা হয়। ইমামের উভয় দিকে দুইটি সালাম আদায়ের পরে তিনি উঠে দাঁড়াবেন এবং যে কয় রাক'আত প্রথমে বাদ পড়েছে তা একাকী আদায় করবেন। তাকে দুই রাক'আত পূর্ণ হলে ও শেষ রাক'আতে পুনরায় বসে উপরের নিয়মে সালাত শেষ করতে হবে। যেমন মনে করুন এক ব্যক্তি ইমামের সাথে আসরের এক রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। তিনি ইমামের উভয় সালামের পরে উঠে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ করে উপরের নিয়মে এক রাক'আত সালাত আদায় করে বসে "আত-তাহিয়্যাতু" পাঠ করবেন। এরপর উঠে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ করে রুকু ও সাজাদা করে সরাসরি পরবর্তী রাক'আতে উঠে দাঁড়াবেন। শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা দ্বারা এই রাক'আত আদায় করে রুকু সাজদার পরে বসে "আত-তাহিয়্যাতু", দরুদ ও দোয়া পড়ে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করবেন।

১০. জামাতে সালাত আদায়ের সময় মুক্তাদীগণের জন্য সুতরার প্রয়োজন নেই, ইমামের সুতরা যথেষ্ঠ। তবে সুন্নাত-নফল সালাত আদায়ের সময় সুতরার বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে, যেন মুসল্লীদের চলাচলে অসুবিধা না হয় এবং সামনে দিয়ে কেউ না যায়।

সালাত ভঙ্গ হওয়ার কারণসমূহ

উপরের বর্ণিত নিয়মে মনোযোগ, আবেগ ও ভক্তির সাথে দেহ ও মনের ধীরতা সহ সালাত আদায় করতে হবে। যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে মাসনূন পদ্ধতির কোন কিছুই স্বেচ্ছায় ত্যাগ না করা। তবে সালাতের পূর্বের বা মধ্যে ফরয কর্মগুলি সক্ষমতা সত্বেও ত্যাগ করলে সালাত ভঙ্গ হয়ে যাবে। এছাড়া নিম্নের কাজগুলি সালাত নষ্ট করে দেয়:

১. সালাতের মধ্যে জাগতিক কথা বলা। সালাতের মধ্যে বান্দা আল্লাহর সাথে কথা বলবে। জাগতিক বা মানুষের সাথে বলার মত কোন কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে সালামের জবাব দিলে, কারো হাঁচির জওয়াব দিলে, দু:সংবাদে "ইন্না লিল্লাহি..." পড়লে, সুসংবাদে আলহামদু লিল্লাহ বললে বা অনুরূপ জাগতিক বিষয়ক যে কোন কথাবার্তা বললে সালাত ভেঙ্গে যাবে।

২. জাগতিক কারণে, কষ্ট বা ব্যথা বেদনার জন্য কাঁদলে বা কাতরালে সালাত ভেঙ্গে যাবে। তবে কুরআন তিলাওয়াতের আবেগের ফলে, জান্নাতের আগ্রহে, জাহান্নামের ভয়ে, আল্লাহর ভালবাসায় বা ভয়ে কাঁদলে সালাত নষ্ট হবে না। তবে নিজেকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করা উচিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ সালাতের মধ্যে আবেগে কাঁদতেন। তবে তাঁদের কান্না গলার মধ্যে অস্পষ্ট শব্দ ও চোখের পানির মধ্যে সীমিত রাখতে চেষ্টা করতেন।

৩. সালাতের মধ্যে "আমলে কাসীর" বা বেশি কাজ করলে। সালাতের মধ্যে বান্দা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। পরিপূর্ণ আদবের সাথে দাঁড়াতে হবে এবং সালাতের প্রয়োজন ছাড়া যথাসম্ভব কম নড়াচড়া করতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত নড়াচড়া, হাত, পা, পোষাক, দাড়ি ইত্যাদি নাড়া পরিহার করতে হবে। বিনা প্রয়োজনে বেশি কর্মে সালাত ভেঙ্গে যায়। বেশি কর্ম বা আমলে কাসীরের সংজ্ঞা হিসাবে বলা হয় যে, যদি কেউ সালাতের মধ্যে বারবার এরূপভাবে হাত পা, পোশাক ইত্যাদি নাড়তে থাকেন বা নড়াচাড়া করতে থাকেন যে, একজন অভিজ্ঞ মানুষ দেখে মনে করেন যে, লোকটি নামাযের মধ্যে নেই বা নামায পড়ছে না তাহলে তা "আমলে কাসীর" এবং তাতে সালাত নষ্ট হবে।

সালাত মুমিনের জীবনের অন্যতম সম্পদ। এর খুঁটিনাটি বিষয়য়াবলী বিস্তারিত জানা প্রত্যেক মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য প্রাথমিক পরিচয় ও নিয়ম শিক্ষাদান। আমি পাঠককে বিস্তারিত জানার জন্য সর্বদা সচেষ্ট হতে অনুরোধ করছি।

তৃতীয় স্তম্ভ : যাকাত

"যাকাত" শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। ইসলামী পরিভাষায় যাকাত বলতে বোঝানো হয় সম্পদশালীর সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্র ও অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করা। যেহেতু যাকাত প্রদানের ফলে যাকাত প্রদানকারীর অন্তর সঞ্চয়ের অতিলোভ থেকে পবিত্র হয়, তার সম্পদ দরিদ্রের অধিকার থেকে পবিত্র হয়, উপরন্তু আল্লাহর বরকতের ফলে তা বৃদ্ধি পায়, সেহেতু আল্লাহ একে "যাকাত" নাম দিয়েছেন। কুরআন ও হাদীসে যাকাতকে প্রায়শ "সাদাকাহ" বা দান ও কখনো কখনো "ইনফাক" বা ব্যয় বলে অভিহিত করা হয়েছে।

যাকাতের গুরুত্ব, সাওয়াব, উপকারিতা ও অবহেলার পরিণতি

কুরআনের বিভিন্ন নির্দেশনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সম্পদ সঞ্চয় ও সংরক্ষণের মানবীয় দুর্বলতা ও কৃপণতার অনুভূতি থেকে মুক্ত হওয়া মুমিনের অত্যাবশ্যকীয় গুণ। আর সম্পদের অতিরিক্ত লোভ ও কৃপণতা মানুষকে কুফুরী ও মুনাফিকীর পথে পরিচালিত করার অন্যতম শক্তি। মানুষ বাহ্যিক অবস্থার বিচারে অর্থ ও সম্পদ সঞ্চয় করতে চায় এবং সঞ্চয়কেই বাহ্যিক বৃদ্ধি বলে বিশ্বাস করে। কুরআন এর বিপরীত কথা বিশ্বাস করতে নির্দেশ দিয়েছে মুমিনগণকে। যাকাত প্রদানই সম্পদ বৃদ্ধি করে আর অবৈধ উপার্জন ও সঞ্চয় সম্পদ ধ্বংস করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসংখ্য বাণী ও নির্দেশনা রয়েছে যাকাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বর্ণনায়। হাদীসের আলোকে ঈমানের মজা লাভ করার অন্যতম উপায় হলো যাকাত প্রদান। খুশি মনে ও পবিত্র হৃদয়ে যাকাত প্রদান করা জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম মাধ্যম। তিনি আরো বলেছেন: "যদি কেউ তার সম্পদের যাকাত প্রদান করে তাহলে তার সম্পদের অকল্যাণ ও অমঙ্গল দূর হয়ে যাবে।"[১০০]

কুরআন থেকে আমরা জানি যে, যাকাত প্রদান না করা মূলত কাফিরদের অন্যতম পরিচয়। যাকাত প্রদান না করা জাহান্নামের শাস্তির অন্যতম কারণ। হাদীসের আলোকে আমরা জানি যে, প্রথম যে তিন ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে তার একজন হলো যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকে যে সম্পদশালী মুসলিম। যাকাত প্রদান থেকে যে মুসলিম বিরত থাকে বা যাকাত দিতে টালবাহনা ও দ্বিধা করে তাকে হাদীসে অভিশপ্ত বা মাল'ঊন বলা হয়েছে। যাকাত প্রদান না করে যে সম্পদ লোভী মানুষ সঞ্চয় করে রাখে কেয়ামতের দিন সেই সম্পদ দিয়েই উক্ত ব্যক্তিকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়েছেন যে, যাকাত প্রদান না করা হলো সেই কঠিন ৫টি পাপের অন্তর্ভুক্ত যার শাস্তি শুধু আখেরাতেই নয়, দুনিয়াতেও ভোগ করতে হয়। আর সেই শাস্তি ব্যক্তিগত জীবনেই নয় সমাজের সকলকেই ভোগ করতে হয়। যে সকল পাপের ফলে সমাজের মানুষ কষ্ট পায়, মানুষের, বিশেষত: দুর্বল শ্রেণীর মানুষের অধিকার নষ্ট হয় সে সকল পাপ যদি সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে সেই সমাজের উপরে আল্লাহর গজব ও শাস্তি নেমে আসে। সেই শাস্তি থেকে পুণ্যবানগণও রক্ষা পান না। কারণ অন্যায়ের প্রতিরোধের দায়িত্বে তারা অবহেলা করেছেন বলেই এসকল পাপ প্রসার লাভ করেছে। তাই এ সকল পাপে সরাসরি পাপী না হলেও নীরবতার পাপে তারা পাপী। দুনিয়ার শাস্তি তাই তাদেরকেও পেতে হবে। হযরত ইবনু উমর (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"হে মুহাজিরগণ, পাঁচটি কর্ম যদি তোমাদের মধ্যে দেখা দেয় তাহলে তা হবে কঠিনতম বিপদ, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেন তোমাদের মধ্যে এগুলো দেখা না দেয়। (১) যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীলতা এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে তারা প্রকাশ্যে অশ্লীলতায় লিপ্ত হতে থাকে, তখন তাদের মধ্যে এমন সব রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে যা তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে প্রসারিত ছিল না। (২) যখন কোন সম্প্রদায়ের মানুষেরা ওজনে কম বা ভেজাল দিতে থাকে, তখন তারা দুর্ভিক্ষ, জীবনযাত্রার কাঠিন্য ও প্রশাসনের বা ক্ষমতাশীলদের অত্যাচারের শিকার হন। (৩) যদি কোন সম্প্রদায়ের মানুষেরা যাকাত প্রদান না করে, তাহলে তারা অনাবৃষ্টির শিকার হয়। যদি পশুপাখি না থাকতো তাহলে তারা বৃষ্টি থেকে একেবারেই বঞ্চিত হতো। (৪) যখন কোন সম্প্রদায়ের মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওয়াদা বা আল্লাহর নামে প্রদত্ত ওয়াদা ভঙ্গ করে, তখন তিনি কোন বিজাতীয় শত্রুকে তাদের উপর ক্ষমতাবান করে দেন, যারা তাদের কিছু সম্পদ নিয়ে যায়। (৫) যদি কোন সম্প্রদায়ের শাসকবর্গ ও নেতাগণ আল্লাহর কিতাব (পবিত্র কুরআন) অনুযায়ী বিচার শাসন না করেন এবং আল্লাহর বিধানের সঠিক ও ন্যায়ানুগ প্রয়োগের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা না করে, তখন আল্লাহ তাদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ও মতবিরোধ সৃষ্টি করে দেন, তারা তাদের বীরত্ব ও শক্তিমত্তা একে অপরকে দেখাতে থাকে।"[১০১]

যাকাত যোগ্য দ্রব্যের শ্রেণীভাগ ও নিয়ম

কুরআন-হাদীসের নির্দেশ অনুসারে মোট ৫ প্রকার সম্পদের যাকাত প্রদান করতে হয়: (১) স্বর্ণ, রৌপ্য ও নগদ টাকা পয়সা, (২) ব্যবসায়ের পণ্য, (৩) চারণভুমিতে পালিত পশু এবং (৪) ভূমির উৎপন্ন ফসল এবং (৫) খনিজ সম্পদ (মা'দিন) ও মাটির নীচে সঞ্চিত সম্পদ (রিকায)।

বাংলাদেশ মুসলিমগণ চারণভুমিতে পশুপালন করেন না এবং সাধারণভাবে খনিজ সম্পদও এদেশে ব্যক্তি মালিকানায় নেই। বাকী খাতগুলোর বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করা হলো। বিস্তারিত বিধান ও দলীল প্রমাণাদি জানতে আমি পাঠককে আমার লেখা অন্য গ্রন্থ: "বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত" নামক বইটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

(ক) সোনা, রূপা ও নগদ টাকার যাকাত

কমপক্ষে যে পরিমাণ দ্রব্য থাকলে যাকাত ফরয হয় তাকে "নিসাব" বলে। সোনার নিসাব হলো ৮৫ গ্রাম, এবং যাকাতেরর পরিমাণ হলো ২.৫% (শতকরা আড়াই) যদি কোন মুসলিম পুরুষ বা মহিলার নিকট ৮৫ গ্রাম বা তার চেয়ে বেশী সোনা বা সোনার অলঙ্কার এক বৎসর থাকে, তাহলে তিনি বৎসরের শেষে তার কাছে মোট যতটুকু সোনা আছে তার মুল্যের শতকরা ২.৫ ভাগ যাকাত প্রদান করবেন। যেমন, যদি তার কাছে ১০০ গ্রাম সোনা থাকে তাহলে তিনি ২.৫ গ্রাম সোনা বা তার মুল্য যাকাত প্রদান করবেন।

এক্ষেত্রে মূলত ২৩ বা ২৪ ক্যারেটের সোনার হিসাব ধরা হয়। যদি নিম্মানের সোনা (২২, ২১,১৮ বা ১৪ ক্যারেটের) থাকে তাহলে ২৩ ক্যারেটের সোনার মুল্যের উপর নির্ভর করে যাকাত প্রদান করতে হবে।

রূপার নিসাব হলো ৬০০ গ্রাম । যাকাতের পরিমাণ ২.৫%। যদি কারো কাছে ৬০০ গ্রাম বা বেশী রূপা থাকে তাহলে প্রতি বৎসর শেষে তিনি মোট রূপার ২.৫% ভাগ যাকাত প্রদান করবেন।

---

[১০০] মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/৬৩, আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৩৮৪।

[101] ইবনু মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, নং ৪০১৯, হাকিম নাইসাবূরী, আল-মুস্তাদরাক ৪/৫৮৩, আলবানী, সহীহুল জামি'য় আস-সগীর ২/১৩২১, নং ৭৯৭৮, সিলসিলাতুল সাহীহাহ ১/২১৬-২১৮, নং ১০৬।

নগদ টাকার ক্ষেত্রে রূপার নিসাবের উপর নির্ভর করতে হবে। হাদীস শরীফে মূলত রূপার নিসাবই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সর্বদা ন্যুনতম নিসাবকে গ্রহণ করতে হয়। এজন্য নগদ টাকা, ব্যবসায়ী দ্রব্য ইত্যাদির জন্য রূপার নিসাবের উপর নির্ভর করতে হবে।যদি কারো কাছে ৬০০ গ্রাম রূপার মূল্য পরিমাণ বা তার বেশী পরিমাণ নগদ অর্থ নিজের ঘরে, ব্যাংকে বা অন্য কারো কাছে সঞ্চিত বা গচ্ছিত থাকে তাহলে তাকে মোট অর্থের ২.৫% ভাগ যাকাত প্রদান করতে হবে।

(খ) ব্যবসায় বা বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত দ্রব্যের যাকাত

ব্যবসায়ের বা বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত সকল দ্রব্যের যাকাত দিতে হবে। ব্যবসায়ের দ্রব্যের নিসাব উপরোল্লিখিতভাবে রূপার নিসাব দ্বারা নির্ধারিত হবে। যদি কেউ বিক্রয়ের জন্য বা ব্যবসা করার জন্য কোন কিছু নির্ধারিত করে রাখেন, যার মূল্য ৬০০ গ্রাম রূপা বা তার বেশী হয় এবং তা এক বৎসর তার নিকট থাকে তাহলে তাকে উক্ত দ্রব্যের মোট বাজার মূল্যের ২.৫% ভাগ যাকাত হিসাবে প্রদান করবেন।

যেমন কেউ বিক্রয়ের জন্য বা ব্যবসা করার জন্য গাড়ী, কম্পিউটার, পুকুরে মাছ, দোকানে ব্যবসায়ের পণ্য ইত্যাদি রেখে দেন তাহলে বৎসর পূর্ণ হলে তাকে রক্ষিত দ্রব্যের মোট বাজার মূল্যের উপর ২.৫% ভাগ যাকাত দিতে হবে। উক্ত দ্রব্য যদি পরের বৎসরও থাকে তাহলে আবারও বর্ষপুর্তিতে তার যাকাত প্রদান করতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ব্যবহারের দ্রব্যের যাকাত প্রদান করতে হবে না। যদি কারো নিজের ব্যবহারের জন্য এক বা একাধিক গাড়ি থাকে তাহলে তার কোন যাকাত নেই। যদি কারো এক বা একাধিক গাড়ি থাকে ভাড়ায় ব্যবহারের জন্য, তাহলে তিনি উপার্জিত অর্থ থেকে প্রতি বৎসর হিসাব মত যাকাত প্রদান করবেন, গাড়ীর মুল্যের কোন যাকাত দিতে হবে না। আর যদি কারো এক বা একাধিক গাড়ি থাকে যা তিনি বিক্রয়ের জন্য রেখেছেন, অর্থাৎ তিনি গাড়ি ক্রয়-বিক্রয় করে ব্যবসা করেন, তিনি গাড়ি বা গাড়িগুলির মুল্য হিসাব করে মোট মুল্যের শতকরা ২.৫ ভাগ যাকাত প্রদান করবেন।

অনুরূপভাবে কারো যদি নিজের ব্যবহারের জন্য এক বা একাধিক বাড়ি থাকে, তাহলে তাকে কোন যাকাত দিতে হবে না। আর যদি ভাড়া দেওয়ার জন্য বাড়ি থাকে তাহলে উপার্জিত অর্থ নিসাব পুর্ণ হলে বৎসর শেষে যাকাত প্রদান করতে হবে, বাড়ীর মুল্যে যাকাত দিতে হবে না। আর যদি বিক্রয়ের জন্য কোন বাড়ি থাকে, তাহলে প্রতি বৎসর বাড়ির মোট মূল্যের যাকাত প্রদান করতে হবে।

ব্যবসায়ের সামগ্রীর যাকাত হিসাবে মূলধন ও লভ্যাংশ সবকিছুর যাকাত প্রদান করতে হবে, শুধু লভ্যাংশের যাকাত নয়। অন্যদিকে যে মূলধন ক্রয়-বিক্রয়ে নিয়োজিত তারই যাকাত দিতে হবে। যেমন কেহ ব্যবসায়ে ৫লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করলেন। ১ লক্ষ টাকায় ঘর তৈরী করলেন বা ভাড়া করলেন, ৫০ হাজার টাকার আসবাব পত্র তৈরী করলেন, এক লক্ষ টাকায় ব্যবসায়ের দ্রব্যাদি পরিবহনের জন্য গাড়ী ক্রয় করলেন, বাকী আড়াই লক্ষ টাকায় তিনি ব্যবসায়ের দ্রব্য খরিদ করে ব্যবসা শুরু করলেন। এক্ষেত্রে তাকে এই আড়াই লক্ষ টাকা ও অন্যান্য উপার্জনের বা লভ্যাংশের যাকাত প্রতি বৎসর আদায় করতে হবে। দোকান, আসবাব ইত্যাদিতে ব্যয়িত আড়াই লক্ষ টাকার যাকাত প্রদান করতে হবে না।

(গ) বিভিন্ন সামগ্রীর একত্রে যাকাত

যদি কারো পৃথকভাবে নিসাবের চেয়ে কম পরিমাণ সোনা, রূপা, নগদ টাকা বা ব্যবসায়ী সামগ্রী থাকে এবং সবকিছু একত্রিত করলে ৮৫ গ্রাম সোনা বা ৬০০ গ্রাম রূপার মুল্যের সমান বা বেশী হয়, তাহলে তাকে যাকাত দিতে হবে। আমরা দেখেছি যে, যেহেতু রূপার মূল্য কম, সেহেতু রূপাকেই নিসাব ধরতে হবে। এজন্য এগুলির মোট মূল্য ১২,০০০ টাকা- বা তার বেশি হলে তাকে যাকাত দিতে হবে।

(ঘ) ফল-ফসলের যাকাত

যাকাতযোগ্য দ্রব্যের অন্যতম হলো ফল ও ফসল। ফল-ফসলের যাকাতের পরিমাণ বেশি। মোট ফল-ফসলের দশভাগের একভাগ বা বিশভাগের একভাগ, অর্থাৎ ১০% বা ৫% ভাগ যাকাত প্রদান করতে হয়। এজন্য ফসলের যাকাতকে "উশর" বা "একদশামাংশ যাকাত" বলা হয়।

আল্লাহ বলেন: "হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের পবিত্র উপার্জন থেকে (যাকাত) ব্যয় কর এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা বাহির করেছি তা থেকে।"[১০২] আরো বলেছেন: "তোমরা যে দিন ফসল কেটে ঘরে তুলবে সে দিন উৎপাদিত ফল-ফসলের হক (যাকাত) আদায় করবে।"[১০৩]

রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন : "বৃষ্টির পানি, প্রবাহিত ঝর্ণার পানি বা মাটির স্বাভাবিক আর্দ্রতা থেকে যে ফল বা ফসল উৎপাদিত হয়, সে ফল ও ফসলের এক দশমাংশ (১০%) যাকাত হিসাবে প্রদান করতে হবে। আর সেচের মাধ্যমে যে ফল বা ফসল উৎপন্ন করা হয় তা থেকে একদশমাংশের অর্ধেক (৫%) যাকাত প্রদান করতে হবে।"[১০৪]

---

[102] সূরা বাকারা: ২৬৭।

[১০৩] সূরা আনআম: ১৪১।

[১০৪] সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, নং ১৪৮৩।

এ মর্মে আরো অনেক হাদীস অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ সকল হাদীসের আলোকে মুসলিম উম্মাহর সকল ইমাম ও আলেম ইজমা' বা ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, অতিরিক্ত সেচ ব্যবস্থা ছাড়া স্বাভাবিক বৃষ্টি, ঝর্ণা, বা নদীর প্রবাহমান পানির মাধ্যমে উৎপাদিত ফসল ও ফলের ১০% যাকাত প্রদান করা মুমিনের উপর ফরয। আর যদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানবীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে অথবা যন্ত্র বা জীবজানোয়ারের মাধ্যমে সেচের পানি সরবরাহ করা হয় তাহলে এভাবে উৎপাদিত ফল ও ফসলের ৫% যাকাত প্রদান করা মুমিনের উপর ফরয।

মুসলিম উম্মাহর ফকীগণ বলেছেন যে, সংরক্ষণযোগ্য সকল ফল ও ফসল, যেমন ধান, পাট, গম, যব, ভুট্টা, ছোলা, মসুরী, কলাই, শরিষা, আখ, তুলা, মধু, লবন ইত্যাদি সকল ফল, ফসল ও ভূমিতে উৎপাদিত দ্রব্যের যাকাত প্রদান করা ফরয। শুধুমাত্র টাটকা শব্জি ও মৌসুমী ফলকে অনেক ইমাম ও ফকীহ যাকাতের আওতার বাইরে রেখেছেন। ইমাম আবু হানীফা ও অন্যান্য ইমাম বলেছেন যে, সবকিছুরই উশর বা যাকাত প্রদান করতে হবে। এজন্য বেগুন, লাউ, টমাটো, শাক, কলা, আম, জাম, লিচু, কাঁঠালসহ যাবতীয় মৌসুমি ফল ও শাকশব্জির ১০% বা ৫% ভাগ যাকাত প্রদান করতে হবে।

ফসলের যাকাতের নিসাব হলো ৬৫৩ কিলোগ্রাম বা প্রায় ১৭ মণ। এই পরিমাণ বা তার বেশী ফল, ফসল, মধু, লবন বা কৃষি উৎপাদন থেকে উপরের হিসাবে যাকাত প্রদান করতে হবে। তবে ইমাম আবু হানীফা বলেছেন যে, এর কম ফল ফসলেরও যাকাত দিতে হবে। অল্পবেশি সব ফসলের যাকাত দিতে হবে।

যদি কেউ একই মৌসুমে একাধিক ফসল উৎপাদন করেন এবং এককভাবে কোন ফসল নিসাব পরিমাণ না হয়, কিন্তু সবফসল মিলালে নিসাব পুর্ণ হয়, তাহলে সব ফসল মিলিয়ে নিসাব পূর্ণ করে যাকাত দিতে হবে। যেমন কেউ ১০ মণ ছোলা ও ১০ মণ মসুর পেলে তাকে ২০ মণ শস্যের ১০% বা ৫% ভাগ যাকাত - পানির উৎস অনুযায়ী- প্রদান করতে হবে। বর্গার ক্ষেত্রে মালিক ও কৃষক প্রত্যেকে নিজ অংশ থেকে যাকাত প্রদান করবেন। জমি, ফসল, গাছ, ফল ইত্যাদি লীজ নেওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত ক্রেতা বা লীজ গ্রহীতা যাকাত প্রদান করবেন।

(ঙ) বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত দিতেই হবে

আল্লাহর কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ, অগণিত হাদীসের নির্দেশ ও মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত বা ইজমাকৃত এই ফরয ইবাদতটি ও ইসলামের অন্যতম রুকনটি আমাদের দেশের অধিকাংশ ধার্মিক মুসলিম পালন করেন না। অনেকে অনেক নফল দান সাদকাহ করেন, কিন্তু ফল ও ফসলের ফরয যাকাত বা উশর প্রদান করেন না। এর পিছনে রয়েছে একটি জঘন্য ও মারাত্মক ভুল ধারণা। আমরা মনে করি যে, আমরা খাজনা ও অন্যান্য কর প্রদান করি এজন্য যাকাত প্রদানের প্রয়োজন নেই। কথাটি জঘন্য মিথ্যা ও আলাহর দ্বীনকে বাতিল করার অন্যতম পথ। এভাবে কেউ ব্যায়ামের কারণে সালাত বাতিল করবে, ট্যাক্স, ঘরভাড়া, ভ্যাট, চাঁদা ইত্যাদির কারণে সম্পদের যাকাত বাতিল করবে, কর্মব্যস্ততা, অতিকষ্ট, পুষ্টিহীনতা, অনাহার ইত্যাদি কারণে সিয়াম বাতিল করবে, টেলিভিশনের প্রচারের জন্য, দেশের অভাবের জন্য হজ্জ বাতিল করবে... নাউযু বিলাহ!

আল্লাহর দেওয়া ফরয দায়িত্ব ও ইসলামের রুকন কখনোই বাতিল বা রহিত হয় না। মুসলিম উম্মাহ একমত যে, কোন অবস্থাতেই কোন দেশে বা জমিতে উৎপন্ন ফসলের যাকাত রহিত হবে না। শুধুমাত্র ইমাম আবু হানীফা (রহ) একটি ক্ষেত্রে উশর না দিলে চলবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইসলামী বিজয়ের সময় কোন কোন জমিতে "ইসলামী খারাজ" আরোপ করা হয়। "খারাজ" সর্বদা উশর বা যাকাতের দ্বিগুণ বা বেশি হয়। এজন্য ইমাম আবু হানীফা (রহ) বলেন যে, তিনটি শর্তে এইরূপ খারাজী জমির ফসলের উশর বা যাকাত না দিলেও চলবে:

১ম শর্ত : ইসলামী পদ্ধতিতে ভূমিটি খারাজী হতে হবে এবং ইসলামী বিজয়ের সময় খারাজী বলে নির্ধারিত হয়েছিল বলে নিশ্চিত জানতে হবে। কোন জমি খারাজী না উশরী এ বিষয়ে সন্দেহ হলে তার উশর দিতেই হবে।

২য় শর্ত: খারাজ ফিকহ অনুসারে ধার্য্যকৃত হবে। খারাজের পরিমাণ ইসলামী নিয়মে উৎপন্ন ফসলের একপঞ্চমাংশ বা অনুরূপ হতে হবে।

৩য় শর্ত: খারাজ গ্রহণকারী সরকার বা রাষ্ট্র ইসলামী সরকার, ইসলামী রাষ্ট্র ও শরীয়ত পালনকারী ও শরীয়ত অনুসারে খারাজ বণ্টনে অঙ্গিকারাবদ্ধ হতে হবে। যদি কোন অনৈসলামিক সরকার ইসলামী পদ্ধতিতে ও ইসলামী পরিমাণ খারাজ মুসলিম নাগরিকের নিকট থেকে সংগ্রহ করে, তাহলে সেই নাগরিককে পুনরায় নিজের পক্ষ থেকে খারাজ বা উশর ইসলামী পদ্ধতিতে বিতরণ করতে হবে।

এ তিনটি শর্তের একটিও বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। এজন্য বাংলাদেশের সকল প্রকার কৃষি উৎপাদনের যাকাত বা উশর প্রদান করা প্রত্যেক ভূমি মালিক বা ভূমি ব্যবহারকারী মুসলিমের উপর ফরয। হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ-সহ সকল মাযহাবের ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন যে, আধুনিক যুগে কোনো মুসলিম বা অমুসলিম দেশে ইসলামী খারাজ ব্যবস্থা প্রচলন নেই। এজন্য মুসলিম মালিকানাধীন সকল ভূ-সম্পত্তির উৎপাদিত ফল ও ফসলের যাকাত প্রদান করা ফরয। পাঠককে **"বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত"** বইটি পড়তে আবার অনুরোধ করছি। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের অন্যতম ফরয ও রুকনটিকে পালন ও জীবিত করার তাওফীক দান করুন।

যাকাত কারা পাবেন

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সুরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে ৮ শ্রেণির মানুষকে যাকাত প্রদানের কথা বলেছেন। বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে এখানে শুধু তিন শ্রেণির উল্লেখ করা হলো

অত্যন্ত দরিদ্র বা কপর্দকহীন, যিনি উপার্জন করতে পারেন না বা অতি সামান্যই উপার্জন করেন। এ ধরনের ব্যক্তিরা যাকাতের অর্থ পাবেন।

অসচ্ছল ব্যক্তি, যিনি উপার্জন করেন, বা যার নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় রয়েছে, কিন্তু তাঁর আয়ে তাঁর প্রয়োজনীয় ব্যয় চালাতে পারেন না, এ শ্রেণির মানুষেরা যাকাত পাবেন।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। যদি কেউ মুলত দরিদ্র নন, কিন্তু শরীয়ত সঙ্গত কারণে বা পাপ নয় এমন কারণে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন, যে ঋণ শোধ করা তার জন্য সম্ভব নয়, তাহলে তাকে ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, যাকাত একমাত্র মুসলিমদের প্রাপ্য। কোন অমুসলিম যাকাত পাবেন না। মুসলিম নামধারী কোন ব্যক্তি যদি নামাজ না পড়েন বা প্রকাশ্য শিরক বা কুফরীতে লিপ্ত থাকেন তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে না।

যাকাতের টাকা বা দ্রব্য ব্যক্তিকে নিঃশর্তে পূর্ণ মালিকানা প্রদান করে দিতে হবে। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ যাকাত গ্রহণের যোগ্য থাকলে তাকে আগে দিতে হবে। যাকাত এবং সকল দানের ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হলো এর উপকার যত ব্যাপক হবে সাওয়াবও তত বেশী হবে। যেমন যে কোন মুসলিম দরিদ্রকে যাকাত প্রদান করা যাবে। তবে একজন দরিদ্র তালেবে এলেম বা আলেমকে যাকাত প্রদান করলে তিনি একদিকে দরিদ্র ব্যক্তি হিসাবে অন্য যে কোন ব্যক্তির ন্যায় উপকৃত হবেন, উপরন্তু এই সাহায্য তাকে অধিকতর ইলম চর্চা ও প্রসারের সুযোগ দেবে, যা উক্ত যাকাত দ্বারা অর্জিত অতিরিক্ত উপকার। এজন্য যাকাত দাতার সাওয়াব বৃদ্ধি পাবে। উশর প্রদানের সময় এই মূলনীতির দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার, যেন আমাদের যাকাত শুধুই ব্যক্তিগত আর্থিক সাহায্য না হয়ে অধিকতর কিছু কল্যাণে পরোক্ষভাবে হলেও অবদান রাখে।

নফল বা অতিরিক্ত দান, "সাদাকাহ" বা ইনফাক

নফল দান, সাদকা, সাহায্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। প্রত্যেক মুমিনের নিয়মিত ও অনিয়মিত দানের অভ্যাস রাখা প্রয়োজন। মানুষের অভাব চিরন্তন। মনের অভাব থেকে কেউই মুক্ত নয়। মুমিন সর্বদা চেষ্টা করবেন অতি প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা মেটানোর পর প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে নিয়মিত কিছু নির্ধারিত এতিম, বিধবা, অসহায় বা অভাবী মানুষকে সাহায্য করার। এছাড়া সর্বদা সাধ্যমতো দান করার চেষ্টা করতে হবে। দানের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও সাওয়াব বিষয়ে হাদীস আলোচনা করার জন্য পৃথক বই প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার অধিপতি ছিলেন। আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুসারে তিনি যুদ্ধলব্ধ গনীমত থেকে এক পঞ্চমাংশ পেতেন। পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা অভাবী মানুষদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্ধ্যার আগেই তাঁর সব সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যেত। মাসের পর মাস তাঁর স্ত্রীগণের ঘরে রান্না করার মতো কিছুই থাকত না। শুধুমাত্র ২/১ টি শুকনো খেজুর ও পানি খেয়েই তাঁদের মাসের পর মাস চলে যেত। এ সকল ঘটনা বিস্তারিত বলতে গেলে বিশাল আকারের বই লিখতে হবে।

সাহাবায়ে কেরাম সর্বদা এ ধরনের ব্যয়ের জন্য আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের জীবনে এ ধরনের অগণিত ঘটনা রয়েছে, যা আলোচনা করলে আমাদের পার্থিব সম্পদ ও বিলাসিতার লোভ কিছুটা কমতে পারে। এ বইয়ের ক্ষুদ্র পরিসরে শুধু দু'টি ঘটনা উল্লেখ করছি। উমর (রা) জাবির (রা)-এর হাতে একটি দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞাসা করেন: দিরহাম দিয়ে কী করবে? জাবির বলেন: আমার সন্তানরা খুবই শখ করেছে গোশত খাওয়ার, তাই তাদের জন্য কিছু গোশত ক্রয় করব। উমর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বারবার বলতে থাকেন – 'শখ করেছে ?' জাবির (রা) বলেন: আমি মনে মনে কামনা করছিলাম, আমার হাতের দিরহামটি যদি হারিয়ে যেত এবং উমর তা না দেখতেন ! উমর (রা) বলেন: "তোমাদের যা শখ হবে তাই কিনবে? তোমাদের মধ্যে কেউ কি চায় না যে, তার ভাইয়ের জন্য ও প্রতিবেশীর জন্য একটু ক্ষুধার্ত থাকবে (নিজে ক্ষুধার্ত থেকে সেই অর্থ তার ভাইকে প্রদান করবে)? আল্লাহ বলেছেন: যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে, সেদিন বলা হবে) তোমরা তোমাদের সুখ ও মজাদার সব কিছু তো পার্থিব জীবনেই ভোগ করে শেষ করে ফেলেছ, সুতরাং আজ তোমাদেরকে অপমানকর আযাবের শাস্তি প্রদান করা হবে।"[১০৫] তোমরা কি কুরআনের এই বাণী ভুলে গেলে ?[১০৬]

অন্য এক ঘটনায় আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) বলেন, একদিন তিনি খাবারের মাজলিসে বসে খাচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর পিতা উমর (রা.) তার ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি সরে গিয়ে তাঁর জন্য মাজলিসের সামনে স্থান করে দেন। উমর (রা.) বসে বিসমিল্লাহ বলে এক লোকমা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় লোকমা মুখে দেওয়ার পরে তিনি বলেন, আমি খাদ্যের মধ্যে চর্বির গন্ধ পাচ্ছি, যা গোশতের চর্বি বলে মনে হচ্ছে না। তখন আব্দুল্লাহ বলেন, আমি বাজারে গিয়েছিলাম মোটাতাজা ছাগলের গোশত কেনার আশায়। কিন্তু বাজারে গিয়ে দেখলাম তার মূল্য বেশি। এজন্য এক দিরহাম দিয়ে রোগাপটকা বকরির গোশত কিনলাম এবং এক দিরহাম দিয়ে ঘি কিনে এর সাথে মিশালাম, যেন ছেলেমেয়েরা ভালোভাবে গোশতটুকু চেটেপুটে খেতে পারে। তখন উমর (রা.) বলেন : "যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দুইটি দিরহাম জমা হতো, তখনই তিনি তার একটি দিরহাম দিয়ে খাদ্য ক্রয় করতেন এবং অন্যটি তিনি দান করতেন।" এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন : "হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি খানা গ্রহণ করুন। ভবিষ্যতে কখনোই আমি এর ব্যতিক্রম করব

---

105 সূরা আহকাফ : ২০ ।

106 ইমাম মালিক, আল-মুআত্তা ২/৯৩৬, হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৪৯৪ ।

না। যদি কখনো আমি দু'টি দিরহামের মালিক হই তাহলে ঠিক রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেভাবে ব্যয় করেছেন (একটি সংসারের জন্য ও অপরটি সমাজের জন্য) সেভাবেই আমি ব্যয় করব।"[১০৭]

কুরআন-হাদীসের আলোকে নফল দানের অভাবনীয় সাওয়াবের কথা আলোচনা করতে হলে পৃথক বৃহৎ বইয়ের প্রয়োজন। তবে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, কুরআন-হাদীসের বর্ণনা থেকে নফল দানের যে বৈশিষ্ট দেখা যায়, তা হলো অন্যান্য সকল ইবাদতের ন্যায় নফল দানেও অগণিত সাওয়াব, মর্যাদা, গোনাহের ক্ষমা ও আল্লাহর রহমত লাভ করেন বিশ্বাসী বান্দা। উপরন্তু তিনি লাভ করবেন এ পার্থিব জীবনে বিপদমুক্তি, উন্নতি ও বরকত। এর কারণ হলো নফল দান আল্লাহর সৃষ্টির সেবা ও সৃষ্টির উপকার কেন্দ্রিক। আর আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির ও বিশেষত মানুষের উপকারে ও সেবায় সবচেয়ে বেশি খুশি হন এবং এজন্য পার্থিব জগতেই তাকে পুরস্কৃত করেন।

চতুর্থ স্তম্ভ : সিয়াম বা রোযা

প্রভাত (সুবহে সাদেক) থেকে সূর্যাস্ত (মাগরিব) পর্যন্ত আল্লাহর এবাদত ও সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পানাহার, দাম্পত্য মিলন ইত্যাদি সকল সিয়াম (রোযা) ভঙ্গকারী কর্ম থেকে বিরত থাকা হল সিয়াম বা রোযা। আত্মার পরিশুদ্ধি, আধ্যাত্মিক উন্নতি, মানবিক মমতাবোধের বিকাশ, তাকওয়া ও সততা অর্জনের জন্য সকল যুগের সকল বিশ্বাসী মানুষের অন্যতম প্রধান অবলম্বন হলো সিয়াম। রমযানের সিয়াম ফরয ও ইসলামের রুকন। এছাড়া যথাসম্ভব বেশি অতিরিক্ত বা নফল সিয়াম পালনে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

চিন্তাহীন, অনুধাবনহীন, সৎকর্মহীন পানাহার বর্জন উপবাস বলে গণ্য হতে পারে তবে ইসলামী সিয়াম বলে গণ্য হবে না। সিয়াম অর্থ সকল নিষিদ্ধ, হারাম কাজে রত থেকে হালাল খাদ্য ও পানীয় থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা নয়। সিয়াম অর্থ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকল নিষিদ্ধ, অন্যান্য পাপ ও অপছন্দনীয় কর্ম বর্জন করার সাথে সাথে হালাল ও সিদ্ধ খাদ্য, পানীয় ও সম্ভোগ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। এভাবে মানব হৃদয়ে সার্বক্ষণিক আল্লাহ সচেতনতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে শত প্রলোভন ও আবেগ দমন করে সততা ও নিষ্ঠার পথে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সিয়াম।

যদি আপনি কঠিন ক্ষুধা বা পিপাসায় কাতর হয়েও আল্লাহর ভয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টির আশায় নিজেকে খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত রাখেন, অথচ সামান্য রাগের জন্য গালি, ঝগড়া ইত্যাদি হারাম কাজে লিপ্ত হন, মিথ্যা অহংবোধকে সমুন্নত করতে পরনিন্দা, গীবত, চোগলখুরী ইত্যাদি ভয়ঙ্কর হারামে লিপ্ত হন, সামান্য লোভের জন্য মিথ্যা, ফাঁকি, সুদ, ঘুষ ও অন্যান্য যাবতীয় হারাম নির্বিচারে ভক্ষণ করেন, তাহলে আপনি নিশ্চিত জানুন যে, আপনি সিয়ামের নামে আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে লিপ্ত আছেন। ধার্মিকতা ও ধর্ম পালনের মিথ্যা অনুভতি ছাড়া আপনার কিছুই লাভ হচ্ছে না।

রাসলুলাহ (ﷺ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি পাপ, মিথ্যা বা অন্যায় কথা, অন্যায় কর্ম, ক্রোধ, মূর্খতাসুলভ ও অজ্ঞতামুলক কর্ম ত্যাগ করতে না পারবে, তার পানাহার ত্যাগ করাতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।"[১০৮] তিনি আরো বলেন: "অনেক সিয়াম পালনকারী আছে যার সিয়াম থেকে শুধুমাত্র ক্ষুধায় কষ্ট করা ছাড়া আর কোন লাভ হয় না।"[১০৯]

অপর দিকে সিয়াম শুধু বর্জনের নাম নয়। সকল নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় কর্ম ও চিন্তা বর্জনের সাথে সাথে সকল ফরয- ওয়াজিব ও যথাসম্ভব বেশি নফল মুস্তাহাব কর্ম করা। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যথাসময়ে আদায় করবেন, জামাতে সালাত আদায় করবেন। ঝগড়া, গালাগালি, রাগারাগি, মিথ্যা, গিবত বা পরনিন্দা-পরচর্চা, ধোঁকা, সুদের কারবার ও অন্যান্য সকল প্রকার নিষিদ্ধ কথা ও কর্ম পরিহার করবেন। এসকল অন্যায় কাজ পরিত্যাগ না করে শুধুমাত্র পানাহার ত্যাগ করলে সে সিয়াম আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না, তাতে বরং ক্ষুধা ও পিপাসায় কষ্ট করাই সার হবে।

সিয়ামের কিছু আহকাম

প্রাপ্ত রয়স্ক (বালেগ), সজ্ঞান, সক্ষম ও নিজ এলাকায় বসবাস কারী (মুসাফির নয়) প্রত্যেক মুসলিমের উপর রমযান মাসের সিয়াম পালন করা ফরয। কাফির বা অমুসলমান সিয়াম পালন করবে না। কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে আগের সিয়ামের কাজা করতে হবে না। অপ্রাপ্ত বয়স্ক (নাবালেগ) বালক বালিকাদের জন্য সিয়াম ফরয নয়, তবে অভ্যস্ত করার জন্য তাদেরকে সিয়াম পালনের নির্দেশ দিতে হবে। পাগল বয়স্ক (সাবালগ) হলেও তার জন্য সিয়াম ফরয নয়, আর তার পক্ষ থেকে কোন মিসকিন খাওয়ান বা ফিদইয়া-কাফ্ফারা দিতে হবে না। কান্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি যার কোন ভালমন্দ জ্ঞান নেই এবং কাণ্ডজ্ঞান রহিত অতি বৃদ্ধেরও একই হুকুম।

যে ব্যক্তি স্থায়িভাবে সিয়াম পালনে অক্ষম, যেমন বৃদ্ধ, বৃদ্ধা বা স্থায়িভাবে অসুস্থ ব্যক্তি, তিনি প্রতিদিনের সিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকিন বা দরিদ্রকে খাওয়াবেন। অসুস্থ ব্যক্তি সিয়াম পালন কষ্টসাধ্য হলে সিয়াম ভাঙবেন। তিনি যদি তাঁর রোগ মুক্তির আশা রাখেন তাহলে তাঁকে মিসকিন বা দরিদ্রকে খাওয়াতে হবে না, বরং তিনি সুস্থ হওয়ার পর কাজা করবেন। গর্ভবর্তী মহিলা এবং যে মহিলা শিশুকে বুকের দুধ পান করাচ্ছেন তাঁরা নিজেদের বা সন্তানের ক্ষতির ভয় থাকলে সিয়াম ভাঙতে পারবেন এবং সমস্যা দূর হবার পর কাজা করবেন। ঋতুবতী মহিলা (হায়েজ বা নিফাস অবস্থায়) সিয়াম পালন করতে পারবেন না, পরে কাজা করবেন।

পানিতে ডুবে যাওয়া বা আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে কোন মানুষকে উদ্ধারের প্রয়োজনে সিয়াম ভাঙ্গা যাবে, পরে কাজা করতে হবে।

---

[107] ইবনু মাজাহ, সুনান ২/১১১৫, কিতাবুল আত'ইমাহ, নং ৩৩৬১।

[১০৮] সহীহ বুখারী ২/৬৭৩, ৫/২২৫১।

[১০৯] ইবনু মাজাহ ১/৫৩৯, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ২/২৯৩, ২৫৬, বুসীরী মিসবাহুয যুযাযাহ ২/৬৯।

মুসাফির বা ভ্রমনরত ব্যক্তি ইচ্ছা করলে সিয়াম পালন করবেন; ইচ্ছা করলে সিয়াম ভঙ্গ করতে পারেন, পরে কাজা করবেন। যারা অস্থায়ী সফর করছেন- যেমন ওমরা পালন করতে যাচ্ছেন- এবং যারা স্থায়ী সফরে থাকেন- যেমন ভাড়াটে ট্যাক্সি বা ট্রাকের চালকগণ- সবার জন্যই এই হুকুম। তাঁরা সবাই যতক্ষণ নিজ এলাকার বাইরে থাকবেন, ইচ্ছা করলে সিয়াম ভাঙতে পারবেন এবং পরে কাজা করবেন।

যে সকল কারণে সিয়াম নষ্ট হয়

ভুলে বা না জেনে পানাহার করলে সিয়াম নষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে যদি ঘুমন্ত অবস্থায় স্খলন হয়, তাহলেও সিয়াম নষ্ট হবে না। কারণ এসবকিছুই জ্ঞান বা ইচ্ছার বাইরে। নিম্নের কারণগুলিতে সিয়াম নষ্ট হবেঃ

১. কোন কিছু আহার বা পান করলে সিয়াম নষ্ট হবে। এমনকি ধুমপান অথবা কোন বিষাক্ত বা ক্ষতিকর কিছু পানাহার করলেও সিয়াম ভেঙে যাবে।

শরীরে পুষ্টি সরবরাহকারী ইনজেকশন বা সালাইন যা খাদ্যের অভাব মেটায় তা ব্যবহার করলে সিয়াম ভেঙে যাবে, কারণ তা পানাহারের সমতুল্য। অন্যান্য সাধারণ ইনজেকশন ব্যবহারে সিয়াম নষ্ট হবে না তা পেশীতেই ব্যবহার করা হোক বা শিরায় ব্যবহার করা হোক। এমনকি ইনজেকশন গ্রহণের পরে ঔষধের স্বাদ গলায় অনুভব করলেও তাতে সিয়াম নষ্ট হবে না। শরীরে রক্ত সরবরাহ করলে, অর্থাৎ সিয়াম পালনকারীর দেহে রক্ত দেওয়া হলে তাতে সিয়াম নষ্ট হবে।

২. স্ত্রী সহবাস করলে সিয়াম নষ্ট হবে। এছাড়া জাগ্রত অবস্থায় ইচ্ছাধীন কোন কাজের মাধ্যমে স্খলন ঘটালে সিয়াম নষ্ট হবে।

৩. মহিলাদের নিয়মিত বা সন্তান প্রসব পরবর্তী রক্ত দেখা দিলে সিয়াম ভেঙে যাবে। সাধারণ রক্তপাতে, যেমন নাক থেকে রক্ত বের হলে বা দাঁত উঠিয়ে ফেলাতে রক্তপাত হলে বা কেটে যাওয়ার ফলে রক্ত বাহির হলে সিয়াম নষ্ট হবে না।

৪. ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে সিয়াম নষ্ট হবে। অনিচ্ছাকৃত বমিতে সিয়ামের ক্ষতি হবে না।

কতগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য

রমযানের সিয়াম পালনের সময় বেশিবেশি কুরআন তিলাওয়াত, দরিদ্রদের সাহায্য করা, দান করা, ইফতার করানো ইত্যাদির জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

সিয়ামের জন্য মনে মনে নিয়্যাত অর্থাৎ সিয়ামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা ইচ্ছা পোষণ করতে হয়। তবে মুখে "নাওয়াতুআন.." ইত্যাদি পাঠ বাতুলতা মাত্র। সিয়াম পালনকারী নাপাক (গোসল ফরজ থাকা) অবস্থায় সিয়ামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ (নিয়েত) করতে পারেন। সুবহে সাদেকের পরে গোসল করে ফজরের সালাত আদায় করে নেবেন। কারণ সিয়াম শুরু করার জন্য পবিত্রতা জরুরী নয়, সালাত আদায়ের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা জরুরি।

কোন মহিলা রমাযান মাসের কোন দিনে সুবহে সাদেকের আগে (মাসিক বা শিশু জন্মদান পরবর্তী) রক্ত থেকে মুক্ত হলে তাঁকে অবশ্যই ঐ দিনের সিয়াম পালন করতে হবে। প্রয়োজনে তিনি সুবহে সাদেকের পরে ফজরের সালাতের আগে গোসল করবেন।

সিয়াম পালনকারীর জন্য প্রয়োজনে নখকাটা, দাঁত ওঠানো, ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগান ইত্যাদি জায়েয, এতে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট কমানোর জন্য প্রয়োজনে স্প্রে ব্যবহার করা জায়েয হবে বলে কোনোকোনো আলেম মত প্রকাশ করেছেন।

সিয়াম পালনকারী সকালে, দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায় যখন ইচ্ছা মেসওয়াক করতে পারেন। সর্বাবস্থার ন্যায় সিয়াম পালনরত অবস্থায়ও মেসওয়াক করা সুন্নাত। সিয়াম পালনকারী তাঁর গরমের কষ্ট বা পিপাসার কষ্ট কমানোর ব্যবস্থা নিতে পারেন, যেমন পানি দিয়ে ঠান্ডা হওয়া, এয়ার-কনডিশনার ব্যবহার করা ইত্যাদি। সিয়াম পালনকারী তাঁর ঠোঁট শুকিয়ে গেলে তা পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিতে পারেন এবং মুখের ভিতর শুকিয়ে গেলে কুলি করতে পারেন। তবে তিনি গড়গড়া করতে পারবেন না।

সিয়াম পালকারীর জন্য সুন্নাত হলো যে, তিনি সেহেরী যথাসম্ভব দেরী করে সুবহে সাদেকের সামান্য আগে খাবেন, আর সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বিলম্ব না করে ইফতার করবেন। ইফতারের সুন্নাত হলো সূর্যস্তের সাথে সাথে তিনটি টাটকা খেজুর দিয়ে ইফতার করা, না হলে খোরমা দিয়ে ইফতার করা। খেজুর বা খুরমা না থাকলে পানি মুখে দিয়ে ইফতার করতে হবে। না হলে যে কোন হালাল খাদ্য দিয়ে ইফতার করা। কোন খাবার বা পানীয় না থাকলে মনে মনে ইফতারের নিয়েত করবেন এবং পরে যখনই সম্ভব হবে পানাহার করবেন।

রমযান মাসের শেষ দশদিন সারারাত জেগে ইবাদত করা, ইতিকাফ করা, লাইলাতুল কদর সন্ধান করা, শেষ দিন বা তার আগে যাকাতুল ফিতর বা ফিতরা প্রদান করা ইত্যাদি বিশেষ ইবাদত।

নফল বা অতিরিক্ত সিয়াম

ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ফরযের অতিরিক্ত সকল ইবাদতকে "নফল" বলা হয়, যার মধ্যে সুন্নাত, মুসতাহাব সবই এসে যায়। হাদীস শরীফে সাধারণভাবে নফল সিয়াম পালনের বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ও তাঁর সাহাবীগণ বছরের সকল মাসেই বেশী করে নফল সিয়াম পালন করতে ভালবাসতেন। তাঁরা নিয়মিত ও অনিয়মিত নফল সিয়াম পালন করতেন। প্রতি দুইদিন পর একদিন, বা একদিন পর একদিন, বা প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার, প্রতি আরবি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ, প্রতি মাসের প্রথমে ও শেষে নিয়মিত নফল রোযা পালনের বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। মুহাররাম মাসে আশুরার রোযা, শা'বান মাসের প্রথম ১৫ দিন রোযা, শাওয়াল মাসে ৬টি রোযা, জিলহজ্জ মাসের ১ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত, বিশেষত ৯

তারিখে আরাফাতের দিনের রোযা পালন করতে হাদীস শরীফে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল রোযার জন্য মুমিন লাভ করেন অপরিমেয় সাওয়াব ও আল্লাহর বিশেষ রহমত, বরকত ও মাগফিরাত।

পঞ্চম স্তম্ভ : হজ্জ

হজ্জ অর্থ ইচ্ছা করা। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পবিত্র কাবা ঘর ও মক্কার কিছু এলাকা যিয়ারত করা ও কিছু ইবাদত পালনের নাম হজ্জ। মক্কা মুকাররামাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম এমন প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও মহিলার জন্য জীবনে একবার হজ্জ আদায় করা ফরজ। বারবার হজ্জ আদায় করা মুস্তাহাব। কেউ হজ্জের আবশ্যকীয়তা বা ফরয হওয়া অস্বীকার করলে তাকে অমুসলিম বলে গণ্য করা হবে। আর যদি কোন সক্ষম ব্যক্তি হজ্জ ফরয মানা সত্বেও তা আদায় না করেন তাহলে তিনি কঠিন পাপের মধ্যে নিপতিত হবেন এবং ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় রয়েছে।

হজ্জ বেশ কিছুদিন ধরে আদায় করতে হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত স্থান থেকে ইহরাম করতে হয়। ইহরাম অর্থ হজ্জের নিয়্যাত করে হজ্জ শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়া। সালাতের তাকবীরে তাহরীমা বললে যেমন নামায শুরু হয় এবং নামাযের বাইরের সকল কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায়, তেমনি হজ্জের ইহরাম করলে হজ্জ শুরু হয় এবং হজ্জ বহির্ভূত সকল কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ইহরাম করে মক্কায় পৌঁছানর পরে হজ্জের বিধানগুলি পালন করতে হয়।

জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে মক্কার প্রান্তরে "আরাফাত" নামক স্থানে অবস্থান করা ও এর আগে ও পরে কাবাঘর তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়া সাঈ করা, মিনায় অবস্থান করা, মিনার জামারাতগুলিতে কাঁকর নিক্ষেপ করা, হজ্জের কুরবানী বা হাদী জবাই করা, মাথা মুণ্ডন করা, এ সকল কর্মের মধ্যে আল্লাহর যিক্‌র করা, দোয়া করা ইত্যাদি হলো হজ্জের কার্যসমূহ। উমরাহ হলো সংক্ষিপ্ত হজ্জ। বছরের যে কোন সময়ে নির্ধারিত স্থান থেকে ইহরাম করে মক্কায় যেয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে আল্লাহর যিকিরের সাথে কাবাঘর সাতবার তাওয়াফ করা, সাফা মারওয়ার মাঝে সাতবার সাঈ করা ও এরপর মাথার চুল কাটা বা ছাঁটা হলো উমরা। জীবনে একবার উমরাহ আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বা ওয়াজিব। এরপর নফল উমরাহ পালন করা যায়।

হজ্জে আল্লাহর একত্ববাদের মহত্তম নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। কারণ একমাত্র আল্লাহর উপাসনার জন্য তৈরী প্রথম উপসনা-গৃহ হল পবিত্র কাবা ঘর। তাওহীদ বা একত্ববাদের চূড়ান্ত বিজয়ের সূচনা হয় হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক এই ঘরের নির্মাণের মধ্য দিয়ে, আর এর সমাপ্তি ঘটে মহানবী (ﷺ) কর্তৃক এই ঘরের পবিত্রতা ও তাওহীদী ধর্মের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। হজ্জে আমরা তাঁদের অগণিত নিদর্শন দেখতে পাই। হজ্জের মাধ্যমে ঈমানের পরীক্ষা হয়। এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ প্রমাণিত করেন তাঁর কোন বান্দা সম্পদ ও শরীরের ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে তা আদায় করে। হজ্জের মাধ্যমে ব্যক্তির মানসিকতা প্রশস্ততা লাভ করে, বৃহৎ মানব গোষ্ঠীর সকল জাতি ও বর্ণের পাশাপাশি সমাবেশ ঘটে। পরস্পরে বর্ণগত, ভাষাগত, দেশগত, জাতিগত সকল হিংসা, বিদ্বেষ ও রেষারেষি হজ্জপালনকারীর হৃদয় থেকে মুছে যায়। সে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে বিশ্ব কত বড় আর সকল মুসলিম কত আপন। মুসলিম জাতির মধ্যে সাম্য, ঐক্য ও সহযোগিতার প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

হজ্জের ফজিলত

হজ্জের ফজিলতে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি নিবেদিতভাবে, সর্বপ্রকার পাপ, অন্যায় ও অশ্লীলতা মুক্ত হয়ে হজ্জ আদায় করলো, সে নবজাতক শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে ঘরে ফিরল।"[১১০] তিনি আরো বলেছেন: "একবার উমরা আদায়ের পরে দ্বিতীয়বার যখন উমরা আদায় করা হয়, তখন দুই উমরার মধ্যবর্তী গোনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন। আর পুণ্যময় হজ্জের একমাত্র পুরস্কার হলো জান্নাত।"[১১১] তিনি আরো বলেছেন: "তোমরা বারবার হজ্জ ও উমরা আদায় কর, কারণ কর্মকারের ও স্বর্ণকারের আগুন যেমন লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা মুছে ফেলে তেমনিভাবে এই দুই ইবাদত দারিদ্র্য ও পাপ মুছে ফেলে। আর পুণ্যময় হজ্জের একমাত্র পুরস্কার হলো জান্নাত।[১১২]

হজ্জ বিষয়ক কিছু ভুল ধারণা

আমাদের দেশে অনেক কৃষক, ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবির উপর হজ্জ ফরয। কারণ অনেকেরই প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি, বাড়ী ও সঞ্চিত অর্থ রয়েছে। হজ্জ আর যাকাতের বিষয় এক নয়। যাকাতের ক্ষেত্রে স্থাবর সম্পতির যাকাত দিতে হয় না। কিন্তু হজ্জের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থাবর সম্পত্তি ধর্তব্য। অনেক আলেম লিখেছেন যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়ী বা জমি বিক্রয় করে হজ্জ পালন করা ফরয।

অনেকে মনে করেন পিতামাতার অনুমতি ছাড়া হজ্জ পালন করা যায় না। চিন্তাটি ভুল। পিতামাতার আনুগত্য প্রত্যেক সন্তানের উপর ফরয। কিন্তু তাদের নির্দেশে আল্লাহর দেওয়া ফরয, ওয়াজিব পিছানো বা নষ্ট করা যাবে না। ফরয দায়িত্ব পালনে তাঁদের অনুমতিও প্রয়োজন নয়। ফরয নামায আদায় এবং ফরয হজ্জ আদায়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে পিতামাতার নিকট থেকে দোয়া নেওয়া, এজাজত নেওয়া খুবই ভাল ও বরকতের কাজ।

---

[১১০] সহীহ বুখারী ২/৫৫৩, ৬৪৫, ৬৪৬।
[১১১] সহীহ বুখারী ২/৬২৯, সহীহ মুসলিম ২/৯৮৩।
[১১২] তিরমিযী ৩/১৭৫, ইবনু মাজাহ ২/৯৬৪, নাসাঈ ৫/১১৫, সহীহ ইবনু খুযাইমা ৪/১৩০।

অনেকে পিতামাতাকে হজ্জ না করিয়ে হজ্জ করাকে অনুচিত মনে করেন। এটিও ভুল। পিতামাতার ভরণপোষণ সন্তানের উপর ফরয দায়িত্ব। তবে হজ্জ ফরয হবে যার অর্থ আছে তার উপর। যদি পিতার নিজস্ব অর্থ থাকে তবে তাকে নিজের দায়িত্বে হজ্জ করতে হবে। সন্তান তাকে সাহায্য করবেন। আর যদি সন্তান অর্থ উপার্জনের কারণে বা নিকটবর্তী কোন দেশে গমনের কারণে তার উপর হজ্জ ফরয হয় তাহলে তাকে আগে নিজের হজ্জ পালন করতে হবে। পরে সম্ভব হলে পিতামাতাকে হজ্জ করানো খুবই ভাল কাজ।

অনেকে মনে করেন মেয়ের বিবাহ বা এ জাতীয় পারিবারিক দায়িত্ব পালন না করে হজ্জে যাওয়া ঠিক না। বিষয়টি পুরোপুরি ঠিক নয়। মেয়ের বিবাহ দানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অতিরিক্ত হজ্জে গমনের অর্থ যদি থাকে তাহলে আগেই হজ্জ করতে হবে। আগের যুগে রাস্তার নিরাপত্তার অভাবে এদেশের মুসলমান সকল সামাজিক দায়িত্ব পালনের পরে চির বিদায় নিয়ে হজ্জে গমন করতেন। বর্তমানে সেই অবস্থা নেই।

অনেকে মনে করেন হজ্জ বৃদ্ধ বয়সের বা শেষ জীবনের ইবাদত। হজ্জের পরে আর কোন সাংসারিক কাজ করা যায় না। অনেকে বলেন, অল্প বয়সে হজ্জ করলে রাখবে কিভাবে! এ সবই শয়তানী ওয়াসওয়াসা ও ইসলামী চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেউ যদি মনে করে যে, সারাজীবন কাফির থাকব, শেষ জীবনে ইমান এনে সকল গোনাহর ক্ষমা লাভ করে মৃত্যু বরণ করব, অথবা চিন্তা করে যে, সারাজীবন বেনামাযী থাকব আর শেষ জীবনে নামায পড়ে গোনাহের ক্ষমা নিয়ে মরব, তাহলে তার চিন্তা যেমন ইসলাম বিরোধী, তেমনি ইসলাম বিরোধী চিন্তা যে, হজ্জ ফরয হওয়ার পরেও তা পালন না করে ভালমন্দ সকল কাজ করতে থাকব এরপর শেষ বয়সে হজ্জ করে ক্ষমা লাভ করে মৃত্যু বরণ করব। এ সবই শয়তানী চিন্তা। নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদির মত হজ্জও একটি ফরয আঈন ইবাদত। যখন যে বয়সেই তা ফরয হোক তা যতশীঘ্র সম্ভব আদায় করতে হবে। আর সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে ও আল্লাহর পথে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

মাওয়াকীত বা ইহরামের সময় ও স্থান

হজ্জ শুরু করার জন্য সময় ও স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ। হজ্জের ইহরাম করার সময় শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহাজ্জ মাসের প্রথম ৯ দিন। হজ্জ বা উমরার ইহরাম করার স্থান নিম্নরূপ :

প্রথম মীকাত যুল হুলাইফা বা আবারে আলী। মক্কা শরীফ থেকে ৪২০ কি. মি. উত্তরে, মদীনার প্রান্তে। মদীনার পথে আগত হাজীরা এখান থেকে ইহরাম করবেন। দ্বিতীয় মীকাত জুহফা। মক্কা শরীফ থেকে ১৮৬ কি. মি. উত্তর পশ্চিমে। সিরিয়া, প্যালেস্টাইনের পথে আগত হাজীরা এখান থেকে ইহরাম করবেন। তৃতীয় মীকাত কারনুল মানাযেল বা সাইল কবীর। মক্কা শরীফ থেকে ৭৮ কি. মি. পূর্বে নজদের পথে আগত হাজীরা এখান থেকে ইহরাম করবেন। চতুর্থ মীকাত ইয়ালামলাম। মক্কা শরীফ থেকে ১২০ কি. মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে লোহিত সাগরের ধারে। ইয়েমেনের দিক থেকে আগত হাজীরা এখান থেকে ইহরাম করবেন। পঞ্চম মীকাত যাতু ইরক। মক্কা শরীফ থেকে ১০০ কি. মি. উত্তর-পূর্বে। ইরাকের দিক থেকে আগত হাজীরা এখান থেকে ইহরাম করবেন।

ইহরামের নিয়ম

উপরোক্ত কোন মীকাতে পৌঁছালে হজ্জ বা উমরা পালনকারীকে নিম্নে নিয়মে ইহরাম করতে হবে। শরীরের ময়লা সাফ করে, নাভির নিম্নে পশম পরিষ্কার করে, গোঁফ কেটে ও শরীরের দুর্গন্ধ দূর করে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করুন। গোসল করুন। পুরুষেরা দুটি সেলাইবিহীন সাদা থান কাপড় পরবেন। মহিলারা যে কোন কাপড় পরতে পারেন। সেলাই বিহীন বলতে বুঝানো হয় শরীরের মাপে সেলাই করা কোন পোষাক হবে না। এমনি থান কাপড়, চাদর, গামছা, ইত্যাদিতে কোন সেলাই বা জোড়া থাকলে কোন অসুবিধা নেই। যানবাহনে আরোহণের পর যাত্রা শুরু হলে ইহরামের নিয়্যাত করে উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়াহ বলতে হবেঃ "লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা- শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল 'হামদা, ওয়ান্নি'য়মাতা লাকা ওয়াল মুলক, ল-শারীকা লাকা। **অর্থাৎ** ঃ "হে আল্লাহ, আমি আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হয়েছি, আমি উপস্থিত হয়েছি। আপনার কোন শরীক নেই, আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হয়েছি। নিশ্চয় সকল প্রশংসা আপনারই জন্য। সকল নেয়ামতের মালিক আপনি। সকল ক্ষমতা ও আধিপত্য আপনারই। আপনার কোন শরীক নেই।" ইহরামের পর থেকে সর্বদা উচ্চস্বরে তালবিয়া বলা উচিত, বিশেষত উঁচুতে উঠতে ও নিচুতে নামতে।

যাঁরা বিমানে হজ্জে বা উমরায় আসেন তাঁরা বিমানে আরোহণের আগেই ইহরামের প্রস্তুতি সেরে ইহরামের কাপড় পরে নিতে পারেন। বিমান মীকাতের কাছাকাছি পৌঁছালে ইহরামের নিয়েত করে তালবিয়া বলবেন।

ইহরাম অবস্থায় নিম্নলিখিত কর্মগুলি নিষিদ্ধ ও বর্জনীয়

প্রথমত, পুরুষ মহিলা সবার জন্য বর্জনীয় : স্বামী-স্ত্রীর মিলন। শরীরে কোন চুল বা পশম কাটা, ছাঁটা বা উঠান। হাত বা পায়ের নখ কাটা। শরীরে বা কাপড়ে সুগন্ধি ব্যবহার করা। কোন জীব-জানোয়ার শিকার করা।

দ্বিতীয়ত, শুধু পুরুষদের জন্য বর্জনীয়ঃ শরীরের মাপে বানানো বা সেলাই করা পোশাক পরা। মাথার সাথে লেগে থাকে এমন কিছু দিয়ে মুখ ঢাকা।

তৃতীয়ত, মহিলারা বর্জন করবেনঃ নেকাব বা বোরকার মুখাবরণ দিয়ে মুখ ঢাকা। হাত মোজা ব্যবহার করা।

উপরে বর্ণিত বর্জনীয় কাজগুলোর কোনটা করলে ক্ষতিপুরণ দিতে হয় যাকে ফিদইয়া বলে। যদি কেউ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে কোন বর্জনীয় কাজ করেন, যেমন চুল কাটেন, নখ কাটেন, সুগন্ধি ব্যবহার করেন, কোন মহিলা যদি মুখে নেকাব বা হাতে হাতমোজ

ব্যবহার করেন, তাহলে তাঁকে প্রত্যেক অপরাধের জন্য একটি ছাগল/ভেড়া/দুম্বা জবেহ করতে হবে, অথবা ৬ জন দরিদ্রকে খাওয়াতে হবে, অথবা ৩ দিন রোজা রাখতে হবে।

তিন প্রকার হজ্জের নিয়মাবলী

হজ্জের মাসে, অর্থাৎ শাওয়াল, যিলকাদ বা যিলহাজ্জ মাসের শুরুতে যে ব্যক্তি উপরে বর্ণিত কোন এক মীকাতে পৌঁছান তিনি নিচের তিন প্রকার হজ্জের যে কোন এক প্রকারের নিয়্যাতে ইহরাম করবেন :

তামাত্তু হজ্জঃ মিকাত থেকে শুধুমাত্র উমরার নিয়েতে ইহরাম করবেন, বলবেনঃ "লাব্বাইকা উমরাতান"। মক্কায় পৌঁছে উমরার তাওয়াফ ও সাঈ করে মাথার চুল চেঁছে বা ছেঁটে ফেলবেন। এরপর যিলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখে শুধুমাত্র হজ্জের নিয়েতে ইহরাম করবেন, বলবেনঃ "লাব্বাইকা হাজ্জান" ও হজ্জের বিধানাবলী পালন করবেন। তামাত্তু হজ্জ পালনকারীকে "হাদয়ী" অর্থাৎ হজ্জের কুরবানী দিতে হবে।

ইফরাদ হজ্জঃ মীকাত থেকে শুধুমাত্র হজ্জের নিয়্যাতে ইহরাম করবেন বলবেনঃ "লাব্বাইকা হাজ্জান"। মক্কা পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম আদায় করবেন। তিনি এ সময় হজ্জের সাঈ করতে পারেন। চুল ছাঁটবেন না বা কাটবেন না বা ইহরাম ভাঙবেন না। বরং ইহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করবেন। যিলহাজ্জ মাসের ৮, ৯, ১০ তারিখে হজ্জের বিধানাবলী পালনের পর তিনি চুল কাটবেন বা ছাঁটবেন এবং হালাল হবেন। (ইফরাদকারী ইচ্ছা করলে সায়ী তাওয়াফে কুদুমের পরে না করে হজ্জের শেষে ফরজ তাওয়াফের পরেও করতে পারেন।) ইফরাদ কারীকে হাদী বা হজ্জের কুরবানী দিতে হবে না।

কিরান হজ্জঃ মীকাত থেকে একত্রে হজ্জ ও উমরার নিয়্যাতে ইহরাম করবেন, বলবেনঃ "লাব্বাইকা উমরাতান ও হাজ্জান"। যদি শুধুমাত্র উমরার ন্যিাতে মক্কায় পৌঁছান এবং উমরা আদায়ের আগেই উমরার সাথে হজ্জের নিয়্যাত করে নেন তাহলেও তা ক্বিরান হজ্জ বলে গণ্য হবে। ক্বিরান হজ্জ পালনকারী অনেকটা ইফরাদ হজ্জ পালন করার মত হজ্জ করবেন। মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফ ও সাঈর মাধ্যমে উমরা আদায় করে ইহরাম অবস্থায় হজ্জের জন্য অপেক্ষা করবেন। জিলহজ্জ মাসের ৮, ৯ ও ১০ হজ্জের বিধানগুলি পালন করবেন। ক্বিরান হজ্জ পালনকারীকে কামাত্তু হজ্জ পালনকরীর ন্যায় "হাদীয়া বা দমের কুরবানী দিতে হবে। এরপর তিনি মাথা মুণ্ডন করাবেন।

হজ্জের কর্মাবলীর সংক্ষিপ্ত ধারণা

হজ্জপালনকারীর জন্য প্রথম মক্কা মুকাররামায় পৌঁছে পবিত্র কাবা ঘরকে সাতবার তাওয়াফ করবেন। এরপর দুই রাক'আত তাওয়াফের সালাত আদায় করে কাবাঘরের উত্তর পূর্ব কোন সাফা পাহাড়ে যাবেন এবং সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে সাতবার সাঈ করবেন। এরপর উমরা পালনকারী বা তামাত্তু হজ্জ পালন কারী পুরুষ মাথা টাক করাবেন, অথবা চুল ছাঁটাবেন। মেয়েরা নখ পরিমাণ চুল ছাঁটবেন। চুল কাটানোর মাধ্যমে তাঁদের ইহরাম শেষ হবে। স্বাভাবিক পোষাকে স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁরা মক্কা মুকাররামায় অবস্থান ও ইবাদত বন্দেগী করবেন। ইফরাদ বা কিরান হজ্জ পালনকারী চুল কাটাবেন না বা ইহরাম ভাঙ্গবেন না। তাঁরা ইহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান ও ইবাদত বন্দেগী করবেন।

যিলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখ থেকে হজ্জের কর্মকাণ্ড শুরু হয়। এদিনে দুপুরের আগে তামাত্তু হজ্জ পালনকারী, যিনি ইতিপুর্বে উমরা করে ইহরাম ছেড়ে মক্কায় অবস্থান করছেন, তিনি পূর্বে ইহরামের সময়ে বর্ণিত নিয়মে মক্কা শরীফে নিজের বাসস্থান থেকে হজ্জের জন্য ইহরাম করবেন। ইফরাদ ও কিরান হজ্জ পালানকারী যেহেতু ইহরাম অবস্থায় থাকেন, সেহেতু তাঁর জন্য উপরের কিছুই করণীয় নয়, তিনি শুধু অন্যদের মত "তালবিয়া" (লাব্বাইকা..) পড়তে পড়তে মিনায় রওয়ানা দিবেন। এখন থেকে ১০ তারিখে আকাবার কাঁকর মারা পর্যন্ত বেশী বেশী তালবিয়া (লাব্বাইকা..) বলতে হবে।

৮ তারিখ মিনায় পৌঁছানর পর হাজীরা সেখানে যোহর, আসর, মাগরীব, ইশার নামায আদায় করবেন এবং রাতে মিনায় অবস্থান করবেন ও ইবাদত বন্দেগী, যিক্‌র আযকারে রত থাকবেন। পরদিন যিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখে ফজরের নামাযের পরে তালবিয়া বলতে বলতে আরাফাতের মাঠে চলে যাবেন। সারাদিন সেখানে আল্লাহর যিক্‌র দোয়া, তাওবা, ইসতিগফার ও কান্নাকাটিতে রত থাকবেন। সূর্যাস্তের পরে শান্তভাবে ও গাম্ভীর্যের সাথে মুযদালিফায় গমন করবেন এবং ফজর পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করবেন।

যিলহাজ্জ মাসের ১০ তারিখ ঈদ ও কুরবানীর দিন সকালে ফজরের সালাতের পরে মিনায় যেয়ে মিনার জামরা নামক স্থানে সর্বশেষ জামরায় ৭টি কাঁকর ছুঁড়বেন। এরপর "হাদীয়" বা হজ্জের পশু জবেহ করবেন। এরপর সম্পূর্ণ মাথার চুল মুণ্ডন করবেন, বা ছাঁটবেন। চুল কাটাতে হজ্জের ইহরামের আংশিক সমাপ্তি হবে। ফলে হাজী সাহেবরা স্বাভাবিক পোশাকাদি পরবেন এবং ইহরামের কারণে বর্জনীয় সকল কর্ম করতে পারবেন, শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর মিলন বর্জন করতে হবে।

এরপর মক্কায় গিয়ে হজ্জের ফরজ তাওয়াফ (ইফাদা) করবেন, তাওয়াফের ২ রাকাত নামাজ পড়বেন এবং সায়ী করবেন। তাওয়াফ ও সায়ী করার পর ইহরাম পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবে এবং হজ্জ পালনকারী সম্পূর্ণ স্বাভাবিকতা অর্জন করবেন।

এরপর মিনায় ফিরতে হবে। ১০, ১১ ও ১২ তারিখ মিনায় অবস্থান করে যিক্‌র আযকার ও দোয়ায় রত থাকতে হবে। ১৩ তারিখ মিনায় অবস্থান ঐচ্ছিক। মিনা ত্যাগের মাধ্যমে হজ্জের আহকাম শেষ হয়। মক্কা ত্যাগ করার পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে।

মদীনা শরীফ যিয়ারত করার সাথে হজ্জের কোন সম্পর্ক নেই। হজ্জের সব কর্ম মক্কা শরীফেই শেষ হয়ে যায়। মদীনা যিয়ারত একটি পৃথক নেক আমল। হজ্জের আগে পরে বা যে কোন সময় তা করা যেতে পারে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে বারবার তার পবিত্র দুইটি হারাম শরীফ নিয়ে যান, দয়া করে আমাদেরকে কবুল করে নেন। আমিন!

দ্বিতীয় অধ্যায়

বেলায়াত, ওয়াসীলাহ, ইহসান ও ওযীফা

আমরা জানি যে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থা, যা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের সকল দিক ও বিষয়কে আবৃত ও নিয়ন্ত্রিত করে। আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে শুধুমাত্র ইসলামের প্রাথমিক পরিচিতি ও প্রত্যেক মুসলিমের ব্যক্তিগত জীবনের পালনের প্রাথমিক কিছু কাজ আলোচনা করছি। আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পরিভাষা ও ব্যক্তিগত কিছু প্রয়োজনীয় দোয়া, মুনাজাত ও যিক্‌র বিষয়ে আলোচনা করব।

বেলায়াত ও ওয়াসীলাহ বা আলাহর বন্ধুত ও নৈকট্য

"বেলায়াত" (الولاية) শব্দের অর্থ বন্ধুত্ব, নৈকট্য, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি। "বেলায়েত" অর্জনকারীকে "ওলী" (الولي), অর্থাৎ বন্ধু, নিকটবর্তী বা অভিভাবক বলা হয়। আল্লাহ বলেন: "জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তাগ্রস্তও হবেন না। যারা ঈমান এনেছেন এবং 'তাকওয়া' করেন।"[১১৩]

ঈমানের পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি। "তাকওয়া" শব্দের অর্থ আত্মরক্ষা করা। যে কর্ম বা চিন্তা করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সেই কর্ম বা চিন্তা বর্জনের নাম তাকওয়া। এজন্য বেলায়াতের পথে নফল মুস্তাহাব পালনের চেয়ে হারাম-মাকরূহ বর্জনের গুরুত্ব বেশি। হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, "তাকওয়া" মূলত অন্তর বা হৃদয়ের অবস্থা। মুত্তাকী ঐ ব্যক্তি যিনি কোন কাজ করার আগেই তার হৃদয়ে চিন্তা হয়, কাজটি সম্পর্কে মহান প্রভু আল্লাহর নির্দেশনা কি এবং তিনি এতে সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে জাগতিক যে কোন ভয়ঙ্কর বিপদ, ধ্বংস বা মৃত্যু থেকে বেশী ভয়ানক বলে তার হৃদয় অনুভব করে।

এ আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানছি যে, দুইটি গুণের মধ্যে ওলীর পরিচয় সীমাবদ্ধ। ঈমান ও তাকওয়া। এই দু'টি গুণ যার মধ্যে যত বেশি ও যত পরিপূর্ণ হবে তিনি বেলায়াতের পথে তত বেশি অগ্রসর ও আল্লাহর তত বেশি ওলী বা প্রিয় বলে বিবেচিত হবেন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে অন্যত্র বলেন: "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আলাহর 'তাকওয়া' কর, তাঁর দিকে 'ওয়াসীলাহ' সন্ধান কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর; আশা করা যায় যে তোমরা সফল হবে।"[১১৪]

এখানে ঈমানের পরে তিনটি কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে: 'তাকওয়া', 'ওয়াসীলাহ' ও 'জিহাদ'। জিহাদ অর্থ প্রচেষ্টা বা পরিশ্রম। আল্লাহর বিধান পালনের ও প্রচারের সকল প্রচেষ্টাকেই কুরআন-হাদীসে কখনো কখনো 'জিহাদ' বলা হয়েছে। সত্যের দাওয়াত, অন্যায়ের প্রতিবাদ, হজ্জ পালন, আলাহর আনুগত্য-মূলক বা আত্মশুদ্ধিমূলক যে কোনো কর্মের চেষ্টাকে জিহাদ বলা হয়েছে। তবে ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ অর্থ "কিতাল" বা মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। "জিহাদ" সমাজের প্রতি মুমিনের দায়িত্ব। মুমিন সাধ্যমত সত্যের দাওয়াত দিবেন এবং সুযোগ থাকলে রাষ্ট্রীয় জিহাদে অংশ নিবেন।

তাকওয়ার অর্থ আমরা আগেই জেনেছি। "ওয়সীলাহ" শব্দটি যদিও বাংলা ভাষায় "উপকরণ" অর্থে ব্যহার করা হয়, তবে কুরআন-হাদীসের আরবী ভাষায় এর অর্থ "নৈকট্য"। আমরা আযানের জাওয়াব প্রসঙ্গে "ওয়াসীলাহ" শব্দের এ অর্থ জেনেছি। আমরা আযানের পরে আল্লাহর কাছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য "ওয়াসীলাহ" বা নৈকট্যের অবস্থান প্রার্থনা করি।

এ দুটি বিষয় পূর্বের আয়াতের তাকওয়ার দুটি পর্যায় বলা চলে। তাকওয়া মূলত আত্মরক্ষামূলক কর্ম, অর্থাৎ ফরয-ওয়াজিব কর্ম করা এবং হারাম-মাকরূহ কর্মাদি বর্জন করা। এর অতিরিক্ত আল্লাহর নৈকট্যমূলক কর্মই মূলত "ওয়াসীলাহ" বলে গণ্য।

তাকওয়া ও ওয়াসীলাহর এ দুটি পর্যায়কে হাদীস শরীফে ফরয ও নফল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুলাহ ﷺ বলেন, "মহান আল্লাহ বলেছেন: 'যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা করে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার নৈকট্য অর্জন বা ওলী হওয়ার জন্য বান্দা যত কাজ করে তন্মধ্যে সবচেয়ে আমি বেশি ভালবাসি যে কাজ আমি ফরয করেছি। (ফরয কাজ পালন করাই আমার নৈকট্য অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে প্রিয় কাজ)। এরপর বান্দা যখন সর্বদা নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আমার বেলায়তের পথে অগ্রসর হতে থাকে তখন আমি তাকে ভালবাসি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবণযন্ত্রে পরিণত হই, যা দিয়ে সে শুনতে পায়, আমি তার দর্শনেন্দ্রিয় হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়, আমি তার হাত হয়ে যাই, যদ্দ্বার সে ধরে বা আঘাত করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যদ্দ্বারা সে হাঁটে। সে যদি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে তাহলে আমি অবশ্যই তাকে তা প্রদান করি। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করি।"[১১৫]

উপরের আয়াত ও হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক মুসলিমই আল্লাহর ওলী, তবে বেলায়াতের পর্যায়ে কমবেশি হয়। ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা বা বিশ্বাস বর্ণনা করে ইমাম তাহাবী (৩২১হি:) বলেন:

المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن

---

[১১৩] সূরা ইউনূস: ৬২-৬৩।

[১১৪] সূরা মায়িদা: ৩৫ আয়াত।

[১১৫] সহীহ বুখারী, কিতাবুর রিকাক, নং ৬৫০২।

"সকল মুমিন করুণাময় আল্লাহর ওলী। তাঁদের মধ্য থেকে যে যত বেশি আল্লাহর অনুগত ও কুরআনের অনুসরণকারী সে ততবেশি আল্লাহর নিকট সম্মানি (ততবেশি ওলী)।[১১৬]

এছাড়া উপরের হাদীস থেকে আমরা নিম্নের বিষয়গুলি বুঝতে পারি:

প্রথমত, আল্লাহর ইবাদত করা ও আল্লাহর পথে চলার ক্ষেত্রে কর্ম হলো দুই প্রকার : (১). ফরয বা অত্যাবশ্যকীয় কর্ম, ও (২). ফরযের অতিরিক্ত নফল বা সুন্নাত ইবাদত। ফরয ইবাদত পালনই আল্লাহর বেলায়েত ও সাওয়াব অর্জনের অন্যতম কর্ম। ফরযের পরে নফল ইবাদত বান্দাকে আল্লাহর বন্ধুত্ব বা বেলায়েতের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়।

দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র ফরয ইবাদত পালন আল্লাহর পরিপূর্ণ বেলায়াত, নৈকট্য ও বন্ধুতের কারণ নয়। ফরযের পরে অবিরত নফল ইবাদত পালনই মানুষকে তার স্রষ্টার প্রেম, ভালবাসা, নৈকট্য ও বন্ধুত্বের মহান নেয়ামতের পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করায়। এ বিষয়ে অনেকেই ভুল করি। কাজটি ফরয নয়, জরুরী নয় কাজেই করব না ইত্যাদি কথা আমরা বলি। এ হলো আল্লাহর প্রেম ও নৈকট্যে আগ্রহহীন হৃদয়ের চিন্তা। অতিরিক্ত টাকা, সম্পদ, মর্যাদা, সুবিধা ইত্যাদির জন্য মনের যতটুকু আকুতি তার চেয়ে অতিরিক্ত সাওয়াব, আখেরাতের মর্যাদা ও আল্লাহর নৈকট্যের আকুতি মনের মধ্যে বেশি না হলে আল্লাহর বন্ধুত্বের, ঈমানের বা তাকওয়ার স্বাদ পাওয়া সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, ফরয ইবাদত পালনের আগে নফল ইবাদত পালন অর্থহীন বা বাতুলতা। ফরয পালন প্রথম ধাপ ও আল্লাহর বেশি ভালবাসা ও সাওয়াবের মাধ্যম। এক্ষেত্রে অনেকেই কঠিন ভুলের মধ্যে নিপতিত। অগণিত ফরয ইবাদতে অবহেলা করে নফল ইবাদত পালন করছেন।

ফরয ইল্‌ম, আকীদা, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্ব, হালাল উপার্জন, সাংসারিক দায়িত্ব, পিতা-মাতা, সন্তান ও স্ত্রীর দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব, সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজ থেকে নিষেধ ইত্যাদি সকল ফরয ইবাদত (যার ক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য) পালন না করে নফল ইবাদত পালন করা, নফল যিক্‌র ইত্যাদি পালন বিশেষ কোনো উপকারে লাগবে না। অবস্থা বিশেষে হয়ত নফল ইবাদত কোনো কোনো ফরয ইবাদতের ঘাটতি পূরণ করতে পারে। কিন্তু কোনো অস্থাতেই তা আল্লাহর নৈকট্য বা বেলায়েতের মাধ্যম নয়। ফরয পরিত্যাগ করলে হারামের গোনাহ হয়। হারামের গোনাহে রত অবস্থায় নফল ইবাদতের অর্থ হলো – সর্বাঙ্গে মলমূত্র লাগানো অবস্থায় নাকে আতর মাখা।

ফরয ইবাদতের মধ্যে যে সকল নফল ইবাদত থাকে তাও ফরযের বাইরের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। নামাযের মধ্যে অসংখ্য ফরয, সুন্নাত ও নফল যিক্‌র আযকার রয়েছে। এগুলি বিশুদ্ধভাবে পালন করা নামাযের বাইরে সারাদিন বিশুদ্ধ মাসনূন যিকিরের চেয়ে অনেক উত্তম। এর অর্থ এই নয় যে, বিশুদ্ধ নামায আদায় করলেই চলবে। এর অর্থ হলো, নফল যিক্‌র আযকারে রত হওয়ার আগে নামায ইত্যাদি ফরয যিক্‌র ও তৎসংশিষ্ট নফল যিক্‌র বিশুদ্ধ ও সুন্দরভাবে আদায় করতে হবে। তা না হলে আমাদের যিক্‌র আযকার পণ্ডশ্রম ও সুন্নাত বিরোধী হয়ে যাবে। মুজাদ্দিদে আলফে সানী লিখেছেন : "আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রদানকারী আমলসমূহ দুই প্রকার। প্রথম প্রকার ফরয কার্যসমূহ, দ্বিতীয় প্রকার নফল কার্যাবলী। নফল আমলসমূহের ফরযের সহিত কোনোই তুলনা হয় না। নামায, রোযা, যাকাত, যিক্‌র, মোরাকাবা ইত্যাদি যে কোনো নফল ইবাদত হউক না কেন এবং তাহা খালেছ বা বিশুদ্ধভাবে প্রতিপালিত হউক না কেন, একটি ফরয ইবাদত তাহার সময় মতো যদি সম্পাদিত হয়, তবে সহস্র বৎসরের উক্তরূপ নফল ইবাদত হইতে তাহা শ্রেষ্ঠতর : বরং ফরয ইবাদতের মধ্যে যে সুন্নাত , নফল ইত্যাদি আছে , অন্য নফলাদির তুলনায় উহারাও উক্ত প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব রাখে।"[১১৭]

এখানে উল্লেখ্য যে, ফরজ ও নফলের দু'টি শ্রেণী রয়েছে, পালন ও বর্জন। কোনো কাজ করা যেরূপ ফরয, তেমনি কিছু কাজ বর্জন করা ফরয। এসকল কাজ করাকে হারাম বলা হয়। অনুরূপভাবে কিছু কর্ম করা নফল-মুসতাহাব বা সুন্নাত। আবার কিছু কাজ বর্জন করাও নফল-মুসতাহাব বা সুন্নাত। এ ধরনের কাজ করা মাকরুহ বা অপছন্দনীয়। মাকরুহ কখনো হারামের নিকটবর্তী হয়, যাকে মাকরুহ তাহরীমি বলা হয়। কখনো তা মাকরুহ তানযিহী বা অনুচিত পর্যায়ের হয়, যা বর্জন করা উত্তম তবে করলে গোনাহ হবে না।

আল্লাহর নৈকট্যের পথে কর্মের চেয়ে বর্জনের গুরুত্ব বেশি। যা করা ফরয তা করতেই হবে। আর যা বর্জন করা ফরয তা বর্জন করতেই হবে। যে ব্যক্তি তার উপরে ফরয এরূপ কোনো কর্ম পালন করছেন না, বা তার জন্য হারাম এরূপ কোনো কার্যে রত রয়েছেন, অথচ বিভিন্ন নফল মুসতাহাব কর্ম পালন করছেন তার কাজকে আমরা ইসলামের শিক্ষা বিরুদ্ধ বলতে বাধ্য। তিনি জেনে অথবা না জেনে ভণ্ডামীতে রত রয়েছেন।

দ্বিতীয় স্তরে নফল পর্যায়ে বর্জনীয় নফলের গুরুত্ব করণীয় নফলের থেকে অনেক বেশি। সাজানোর পূর্বে পরিচ্ছন্নতা। নিজেকে নোংরা, অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত করে এরপর যতটুকু সম্ভব সাজগোজ করতে হবে। এজন্য সকল প্রকার মাকরুহ বর্জন করা নফল

---

[১১৬] ইমাম তাহাবী, আল-আকীদাহ (শারহ সহ), পৃ: ৩৫৭-৩৬২।

[১১৭] মুজাদ্দিদ ই আলফি সানী, মাকতুবাত শরীফ (বঙ্গানুবাদ শাহ মোহাম্মদ মুতী আহমদ আফতাবী (ঢাকা, আফতাবীয়া খানকাহ শরীফ, ৩য় প্রকাশ, ১৪২০হি.) মাকতুব ২৯, ১/ ৫৭।

ইবাদতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "আমি তোমাদেরকে কোনো কিছু নিষেধ করলে তা সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করবে। আর তোমাদেরকে যা করতে নির্দেশ প্রদান করব তা সাধ্যমত করবে।"[১১৮]

উপরের আয়াত, হাদীস ও কুরআন-সুন্নাহর অন্যান্য নির্দেশনার আলোকে আমরা বেলায়াত ও ওয়াসীলাহ বা আলাহর বন্ধুত্ব ও নৈকট্য অর্জনের কর্মগুলিকে নিম্নলিখিত আটটি পর্যায়ে সাজাতে পারি:

(১) বিশুদ্ধ ও অবিচল ঈমান।

(২) বৈধ উপার্জন। ঈমানের পরে সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো বৈধভাবে উপার্জিত জীবিকার উপর নির্ভর করা। সুদ, ঘুষ, ফাঁকি, ধোকা, জুলুম ইত্যাদি সকল প্রকার উপার্জন অবৈধ। অবৈধ উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারীর ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়।

(৩) সৃষ্টির অধিকার সংশ্লিষ্ট হারাম বর্জন। হারাম বা যে সকল কর্ম বর্জন করা ফরয তা দুই প্রকার: এক প্রকার পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টির অধিকার বা পাওনা নষ্ট বা তাদের কোনো ক্ষতি করা বিষয়ক হারাম। এগুলি বর্জন করা সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ।

(৪) আল্লাহর অন্যান্য আদেশ নিষেধ বিষয়ক হারাম বর্জন। এগুলি দ্বিতীয় পর্যায়ের হারাম কর্ম, যা বর্জন করা ফরয।

(৫) ফরয কর্মগুলি পালন।

(৬) মাকরুহ তাহরীমি বর্জন ও সুন্নাতে মু'আক্কাদা কর্ম পালন।

(৭) মানুষ ও সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণমূলক সুন্নাত-নফল ইবাদত পালন।

(৮) ব্যক্তিগত সুন্নাত-নফল ইবাদত পালন।

ফরয, হারাম ও কবীরা গোনাহ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারছি যে, নফল পালনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ঈমান, ইসলাম ও বেলায়াত অর্জন করতে হলে আগে ফরয দায়িত্বগুলি যথাযথ পালন করতে হবে। যা করা ফরয তা করতে হবে এবং যা বর্জন করা ফরয তা বর্জন করতে হবে। এককথায় "কবীরা গোনাহ" বা কঠিন পাপসমূহ বর্জন করতে হবে।

করণীয় ফরযের তালিকার চেয়ে বর্জনীয় ফরযের তালিকা প্রদান সহজ। কারণ প্রথমত, কুরআন ও হাদীসে বর্জনের বিষগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, যেহেতু করার বিপরীত বর্জন তাই এই বর্জনের তালিকা থেকেই করণীয় ফরয বুঝা যায়। তৃতীয়ত, অধিকাংশ করণীয় ফরয আপেক্ষিক ও ব্যক্তির অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

ঈমান, সালাত ও সিয়াম মূলত সর্বজনীন ফরয। পুরুষদের নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত ও মহিলাদের মাহরাম ছাড়া পুরুষদের সামনে মাথা ও চুলসহ সমস্ত শরীর (মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতিক্রম) আবৃত রাখা, ঈমান, আকীদা ও দ্বীন পালনকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ইলম শিক্ষা, হালাল উপার্জন ইত্যাদি কিছু বিষয় সর্বজনীন ফরয। এছাড়া অধিকংশ ফরয কারো জন্য প্রযোজ্য ও কারো জন্য প্রযোজ্য নয়।

আমরা দেখেছি যে, ইসলামের বাকী দুইটি রুকন যাকাত ও হজ্জ সবার উপর ফরয নয়। যার পিতামাতা আছেন তার জন্য তাদের সেবা করা ফরয। যার স্ত্রী ও পরিবার রয়েছে তার জন্য এদের সাধ্যমত উত্তম ভরণপোষণ ও ইসলাম অনুযায়ী পরিচালনা ফরয। যিনি কোন অন্যায় দেখতে পাচ্ছেন যা অন্য কেউ দেখছে না, তার জন্য সাধ্যমতা তার পরিবর্তন বা প্রতিবাদ ফরয। একাধিক মানুষ তা জানতে পারলে সকলের উপর তা সামষ্টিক ফরয বা ফরযে কিফাইয়া।

অনুরূপভাবে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিকভাবে বিচারের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য ফরয আল্লাহর বিধান অনুসারে ন্যায়বিচার করা। যিনি এ দায়িত্বে নিয়োজিত নন তার উপর তা ফরয নয়। তবে এ ধরণের কেউ যদি জানতে পারেন যে, কেউ এভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করছে না, তাহলে তাকে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার অনুরোধ বা আদেশ প্রদান তার উপর ফরয হতে পারে।

একারণে আমরা এ পুস্তিকার সংক্ষিপ্ত পরিসরে শুধুমাত্র ঐ সকল হারাম বা বর্জনীয় ফরযের তালিকা প্রদান করছি, যে সকল কর্মের জন্য কুরআন- হাদীসে অভিশাপ, লা'নত, কঠিন শাস্তি বা উম্মতের তালিকা থেকে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এ সকল পাপ বা অপরাধকে আমরা দুইভাগে ভাগ করতে পারি : ব্যক্তিগত বা হক্কুল্লাহ বিষয়ক ও সামাজিক বা হক্কুল ইবাদ বিষয়ক। যদিও উভয় প্রকার পাপই আল্লাহর অবাধ্যতা ও পরস্পরে সম্পৃক্ত, তবুও সংক্ষেপে বুঝার জন্য দুইভাগ করে আলোচনা করছি :

(ক) হক্কুলাহ বিষয়ক বা ব্যক্তিগত কবীরা গুনাহসমূহ

১. **ঈমান বিষয়ক :** ইতিপূর্বে ঈমান অধ্যায়ে আলোচিত সকল প্রকার শিরক, কুফর, নিফাক, বিদ'আত। আলাহর শাস্তি থেকে নিরাপত্তা বোধ করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া, মক্কার হারামে কোনো প্রকার অন্যায় করার ইচ্ছা, নিজের জীবন, সম্পদ, ও সকল মানুষের চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বেশি ভালবাসায় ত্রুটি থাকা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামে মিথ্যা হাদীস বলা, নিজের পছন্দ-অপছন্দ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের অনুগত না হওয়া, আত্মহত্যা করা।

২. **ফরয ইবাদত পরিত্যাগ বিষয়ক :** আরকানে ইসলাম বা যে কোন ফরয ত্যাগ করা, ধর্ম পালনে অতিশয়তা বা সুন্নাতের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ইবাদত করা, নামাযরত ব্যক্তি সামনে দিয়ে গমন করা।

৩. **হারাম খাদ্য ও পানীয় :** মদপান, মৃত প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের গোশত ভক্ষণ করা, স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে পান করা।

---

[১১৮] সহীহ মুসলিম ৪/১৮৩০, নং ১৩৩৭। (বুখারী ৬/২৬৫৮, নং ৬৮৫৮, মুসলিম ২/৯৭৫, নং ১৩৩৭)

৪. **পবিত্রতা ও অন্যান্য অভ্যাস বিষয়ক :** পেশাব থেকে পবিত্র না হওয়া, মিথ্যা বলার অভ্যাস, প্রাণীর ছবি তোলা বা আঁকা, কৃত্রিম চুল লাগান, শরীরে খোদায় করে উল্কি লাগান। নিয়মিত অপবিত্র অবস্থায় দাম্পত্যমিলন। পুরুষের জন্য মেয়েলী পোশাক বা চাল চলন, টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পোশাক পরা, সোনা ও রেশমের ব্যবহার, গোফ বেশি বড় করা, দাড়ি না রাখা। মেয়েদের জন্য পুরষালী পোশাক বা আচরণ, সৌন্দর্য প্রকাশক পোশাক পরিধান করে, মাথা, মাথার চুল বা শরীরের কোনো অংশ অনাবৃত রেখে বা সুগন্ধি মেখে বাইরে যাওয়া।

৫. **অন্তরের বা মনের পাপ :** অহংকার, গর্ব করা, নিজেকে বড় ভাবা, নিজের কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, রিয়া, হিংসা, কোনো মুসলিমকে হেয় বা ছোট ভাবা, কৃপণতা, দ্বীনী ইল্‌ম পার্থিব উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা, ইল্‌ম গোপন করা।

(খ) সৃষ্টির অধিকার নষ্ট বা কষ্ট প্রদান সংক্রান্ত কবীরা গোনাহসমূহ

কুরআন ও হাদীস পর্যালোচনা করলে প্রতিভাত হয় যে, মানুষের মূল দায়িত্ব দুইটি ও পাপের সূত্রও দুইটি। প্রথম দায়িত্ব হলো মানুষ তার মহান প্রভুর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস, অগাধ ভালবাসা ও আস্থা পোষণ করবে এবং এই আস্থা, বিশ্বাস ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এমন সকল কর্ম আল্লাহর মনোনীত রাসূলের শিক্ষা অনুসারে পালন করবে। আর এই দায়িত্বে অবহেলা সৃষ্টি করে এমন সকল কর্ম বা চিন্তা চেতনাই প্রথম পর্যায়ের পাপ।

মানুষের দ্বিতীয় দায়িত্ব এ পৃথিবীকে সুন্দর বসবাসযোগ্য করতে তার আশেপাশে সকল মানুষ ও জীবকে তারই মতো ভালোভাবে বাঁচতে সাহায্য করা। আর এই দায়িত্বের অবহেলাজনিত কর্মই দ্বিতীয় পর্যায়ের পাপ। আল্লাহর সৃষ্টির কষ্ট প্রদান, ক্ষতি করা, শান্তি বিনষ্ট করা বা অধিকার নষ্ট করাই হলো মূলত সবচেয়ে কঠিন অপরাধ। এ জাতীয় পাপগুলিকে কুরআন বা হাদীসে বেশি আলোচনা করা হয়েছে, বেশি বিশ্লেষণ ও ভাগ করা হয়েছে। একই জাতীয় পাপের শাখা প্রশাখাকে বিশেষভাবে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে এর তালিকাও অনেক বড় হয়ে গিয়েছে।

১. ইসলাম নির্ধারিত শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধীর (চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি) শাস্তি মওকুফের জন্য সুপারিশ বা চেষ্টা করা।

২. আইনের মাধ্যমে বিচার ছাড়া কোনো মানুষকে খুন বা হত্যা করা। এমনকি ডাকাতী, খুন, ধর্মদ্রোহিতা ইত্যাদি ইসলামী বিধানে যে অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলে নির্ধারিত সেই অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিকেও কোনো ব্যক্তি নিজের হাতে শাস্তি দিলে তা হবে খুন বা হত্যা। একমাত্র উপযুক্ত আদালতের বিচারের মাধ্যমেই অপরাধীর অপরাধ, তার মাত্রা ও তার শাস্তি নির্ধারিত হবে। যথাযথ বিচারে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে কাউকে অপরাধী মনে করা বা শাস্তি দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টির অধিকার নষ্টকারী কঠিন অপরাধ।

৩. রাষ্ট্রপ্রধান, প্রশাসক বা বিচারক কর্তৃক জনগণের দায়িত্ব, সম্পদ বা আমানত আদায়ে অবহেলা বা ফাঁকি দেওয়া।

৪. নাগরিক কর্তৃক রাষ্ট্রপ্রধান, শাসক, প্রশাসক বা প্রধানকে ধোঁকা দেওয়া বা রাষ্ট্রের ক্ষতিকর কিছু করা।

৫. রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা সশস্ত্র বিদ্রোহ।

৬. অন্যায় দেখেও সাধ্যমতো প্রতিকার বা প্রতিবাদ না করা।

৭. রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের বাইরে থেকে মৃত্যুবরণ করা।

৮. রাষ্ট্র প্রশাসনের অন্যায় বা জুলুম সমর্থন বা সহযোগিতা করা।

৯. সমাজের মানুষদেরকে কবীরা গোনাহের কারণে কাফির বলা বা মনে করা।

১০. বিচারকের জন্য ন্যায় বিচারে একনিষ্ঠ না হওয়া বা বিচার্য বিষয়ের বাইরে কোনো কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিচার করা।

১১. আইন প্রয়োগকারীর জন্য আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করা ও আপনজনদের জন্য হালকাভাবে শাস্তি প্রয়োগ করা।

১২. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বা প্রয়োজনের সময় সত্য সাক্ষ্য না দেওয়া।

১৩. রাষ্ট্রীয় সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ বা দখল করা, তা যত সামান্যই হোক।

১৪. মুনাফিককে নেতা বলা।

১৫. জিহাদের মাঠ থেকে পালিয়ে আসা।

১৬. মুসলিমগণকে কষ্ট প্রদান ও গালি দেওয়া।

১৭. যবরদস্তি, মিথ্যা মামলা বা অবৈধভাবে কোনো মানুষ থেকে কিছু গ্রহণ করা।

১৮. হাটবাজার, রাস্তাঘাটে টোল আদায় করা বা চাঁদাবাজী করা।

১৯. মুসলিম সমাজে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিককে কষ্ট প্রদান বা তার অধিকার নষ্ট। যে কোনো মানুষকে কষ্ট দেওয়াই কঠিন পাপ। তবে হাদীস শরীফে সাধারণ নির্দেশনা ছাড়াও বিশেষ করে সমাজের দুর্বল শ্রেণিগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২০. কোনো মহিলা বা এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা। যে কোনো মানুষের সামান্যতম সম্পদ অবৈধভাবে গ্রহণ অন্যতম কবীরা গোনাহ। তবে মহিলা ও এতিম যেহেতু দুর্বল এজন্য হাদীস শরীফে তাদের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে তাদের সম্পদ অবৈধ বা জবরদস্তি দখল বা ভোগকারীর জন্য কঠিনতম শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২১. আল্লাহর প্রিয় ধার্মিক বান্দাগণকে কষ্ট প্রদান বা তাদের সাথে শত্রুতা করা।

২২. প্রতিবেশীর কষ্ট প্রদান।
২৩. কোনো মাজলিসে খালি জায়গা দেখে না বসে ঠেলাঠেলি করে অন্যদের কষ্ট দিয়ে মাজলিসের মাঝে বসে পড়া বা এমনভাবে মাঝে বসা যাতে অন্যদের অসুবিধা হয়।
২৪. কারো স্ত্রী বা চাকর বাকর ফুসলিয়ে সরিয়ে দেওয়া।
২৫. কর্কশ ব্যবহার ও অশীল- অশ্রাব্য কথা বলা।
২৬. অভিশাপ বা গালি দানে অভ্যস্ত হওয়া।
২৭. কোনো মুসলিমের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু অর্থলাভ করা।
২৮. দীর্ঘ দিন কোনো মুসলিমের সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখা।
২৯. মুসলিমগণের একে অপরকে ভালো না বাসা, বা পারস্পারিক ভালবাসার অভাব থাকা।
৩০. মুসলিমদের গোপন দোষ খোঁজা, জানা ও বলে দেওয়া।
৩১. নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্যের জন্য তা পছন্দ না করা।
৩২. কোনো ব্যক্তিকে তার বংশের বিষয়ে অপবাদ দেওয়া।
৩৩. পিতামাতার অবাধ্য হওয়া বা তাঁদের কষ্ট প্রদান করা।
৩৪. সুদ গ্রহণ করা, প্রদান করা, সুদ লেখা বা সুদের সাক্ষী হওয়া।
৩৫. ঘুষ গ্রহণ করা, প্রদান করা ও ঘুষ আদান প্রদানের মধ্যস্থতা করা।
৩৬. মিথ্যা শপথ করা।
৩৭. হীলা বিবাহ করা বা করানো।
৩৮. আমানতের খেয়ানত করা।
৩৯. কোনো মানুষের উপকার করে পরে খোঁটা দেওয়া।
৪০. মানুষের গোপন কথা শোনা বা জানার চেষ্টা করা।
৪১. স্ত্রীর জন্য স্বামীর অবাধ্য হওয়া।
৪২. স্বামীর জন্য স্ত্রীর টাকা বা সম্পদ তার ইচ্ছার বাইরে ভোগ বা দখল করা।
৪৩. চোগলখুরী করা বা একজন মানুষের কাছে অন্য মানুষের নিন্দামন্দ ও শত্রুতামূলক কথা বলে উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক নষ্ট করা।
৪৪. পরচর্চা করা বা কারো অনুপস্থিতিতে তার মধ্যে বিরাজমান দোষগুলি উল্লেখ করা।
৪৫. জমির সীমানা পরিবর্তন করা।
৪৬. মহান সাহাবীগণকে গালি দেওয়া।
৪৭. আনসারগণকে গালি দেওয়া।
৪৮. পাপ বা বিভ্রান্তির দিকে বা খারাপ রীতির দিকে আহ্বান করা।
৪৯. কারো প্রতি অস্ত্র জাতীয় কিছু উঠান বা হুমকি প্রদান।
৫০. নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলা।
৫১. জেদাজেদি ঝগড়া, বিতর্ক কলহ বা কোন্দল।
৫২. ওজন, মাপ বা দ্রব্যে কম দেওয়া বা ভেজাল দেওয়া।
৫৩. কোনো উপকারীর উপকার অস্বীকার করা বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।
৫৪. নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অন্যকে প্রদান থেকে বিরত থাকা।
৫৫. কোনো প্রাণীর মুখে দাগ বা মার্কা দেওয়া।
৫৬. জুয়া খেলা।
৫৭. অবৈধ ঝগড়া বা গোলযোগে সহযোগিতা করা।
৫৮. কথাবার্তায় সংযত না হওয়া।
৫৯. ওয়াদা ভঙ্গ করা।
৬০. উত্তরাধিকারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা।
৬১. স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক তাদের একান্ত গোপনীয় কথা অন্য কাউকে বলা।
৬২. কারো বাড়ি বা ঘরের মধ্যে অনুমতি ছাড়া দৃষ্টি করা।
৬৩. কেউ আল্লাহর নামে শপথ করে সাহায্য বা ক্ষমা চাইলে বিরক্ত হওয়া।
৬৪. যা কিছু শোনা হয় যাচাই ও সত্যাসত্য নির্ধারণ না করে তা বলা।
৬৫. বঞ্চিত ও দরিদ্রদেরকে খাদ্য বা সাহায্য প্রদানে উৎসাহ না দেওয়া।
৬৬. ব্যভিচার, সমকামিতা বা যৌন অনাচার ও অশ্লীলতা।

৬৭. নিরপরাধ মানুষকে, বিশেষত মহিলাকে ব্যভিচার বা অনৈতিকতার অপবাদ দেওয়া।
৬৮. মুসলিম সমাজে অশ্লীলতা প্রসার করতে পারে এমন কোনো গল্পগুজব বা কথাবার্তা, বই, ছবি ইত্যাদি বলা বা প্রচার করা।

ইহসান বা সৌন্দর্য ও পূর্ণতা

"ইহসান" শব্দের অর্থ কোন বিষয় সুন্দর করে পালন করা বা কারো উপকার ও কল্যাণ করা। যিনি "ইহসান" পালন করেন তিনি "মুহসিন"। কুরআন ও হাদীসে এই দুই অর্থে "ইহসান" ও "মুহসিন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদীসে "ইহসান" বা সুন্দর ও পূর্ণ ইসলামের অধিকারী মুসলিমের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "ইহসান হলো, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাকে দেখছ। কারণ তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনি তোমাকে দেখছেন।"[১১৯]
এ হলো মুত্তাকী হৃদয়ের পূর্ণতার অবস্থা। আর এভাবে নিজের যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী ও জীবন পরিচালনাকারী মুমিনই বেলায়াত, স্রষ্টার প্রেম ও নৈকট্যের মহান নেয়ামতের অতুলনীয় স্বাদ অনুভব করেন।

সুন্নাত ও ইত্তিবায়ে সুন্নাত

বেলায়াত, ওয়াসীলাহ ও ইহসান, অর্থাৎ আলাহর বন্ধুত্ব, নৈকট্য ও পূর্ণতা অর্জনের অন্যতম বিষয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণ-অনুকরণ, বা "ইত্তিবায়ে সুন্নাত"। ঈমান, তাকওয়া ও ওয়াসীলাহ- সকল পর্যায়েই 'ইত্তিবা' অন্যতম বিষয়। আমরা দেখেছি যে, রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর নিঃশর্ত, পরিপূর্ণ ও অবিমিশ্র (ধনংড়ষঁঃব) অনুসরণ-অনুকরণ রিসালাতের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাকওয়া অর্জনও ইত্তিবা ছাড়া সম্ভব নয়। রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর অনুকরণের ব্যতিক্রম ইবাদত করাকে বিভ্রান্তি ও শাস্তির কারণ বলে হাদীসে বারংবার বলা হয়েছে। ওয়াসীলাহ বা নৈকট্য অর্জনের সবচেয়ে সহজ পথ "সুন্নাত" পদ্ধতিতে আমল করা। এভাবে আমরা দেখছি যে, আল্লাহর ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও নৈকট্য লাভের একমাত্র পথ ইত্তিবায়ে সুন্নাত। মহান আল্লাহ বলেন: "তোমরা যদি আল্লাহকে মহব্বত কর তবে আমার অনুসরণ-অনুকরণ কর; তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন।"[১২০]
এ কারণে আমরা সুন্নাত, ইত্তিবায়ে সুন্নাত, খেলাফে সুন্নাত ও বিদআত সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

(ক). সুন্নাত বনাম খেলাফে সুন্নাত

সুন্নাত শব্দের অর্থ, ব্যবহার, সুন্নাতের গুরুত্ব, মর্যাদা, সুন্নাতের খেলাফ চলার ভয়াবহ পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ে **"এহ্ইয়াউস সুনান"** –গ্রন্থে আলোচনা করেছি। সংক্ষেপে সুন্নাত শব্দের অর্থ: ছবি, জীবন পদ্ধতি, কর্মধারা ইত্যাদি। ইসলামী শরীয়তে 'সুন্নাত' শব্দের দু ধরনের প্রয়োগ রয়েছে:

(১). রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর সকল প্রকারের নির্দেশ, কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শ। এছাড়া তাঁর সাহাবীদের কর্ম ও আদর্শও এ অর্থে 'সুন্নাত' বলে অভিহিত হয়।

(২). সুন্নাতের দ্বিতীয় ও প্রচলিত অর্থ, ফরয ও ওয়াজিব-এর পরবর্তী পর্যায়ের কর্ম, যা করা প্রয়োজন, বা করা উত্তম।

সাধারণভাবে দ্বিতীয় অর্থটিই প্রচলিত। তবে কুরআন, হাদীসে ও উলামায়ে কেরামের ভাষায় ইত্তেবায়ে সুন্নাত বা সুন্নাতের অনুসরণের নির্দেশনার ক্ষেত্রে "সুন্নাত" বলতে প্রথম অর্থ বুঝান হয়। এ অর্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামগ্রিক জীবন পদ্ধতিই সুন্নাত।

যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয হিসাবে করেছেন তা ফরয হিসাবে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি নফল হিসাবে করেছেন তা নফল হিসাবে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি সর্বদা নিয়মিতভাবে করেছেন তা সর্বদা নিয়মিতভাবে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি মাঝে মাঝে করেছেন তা মাঝে মাঝে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি কখনো করেননি, অর্থাৎ সর্বদা বর্জন করেছেন তা সর্বদা বর্জন করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি মাঝে মাঝে বর্জন করেছেন তা মাঝে মাঝে বর্জন করাই তাঁর সুন্নাত।

যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ করতে নির্দেশ দিয়েছেন বা উৎসাহ প্রদান করেছেন তা পালনের ক্ষেত্রে তাঁর পালনপদ্ধতিই সুন্নাত। যে কাজ তিনি করতে নিরুৎসাহিত করেছেন বা বর্জন করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন তা তাঁর কর্মপদ্ধতির আলোকে বর্জন করাই সুন্নাত।

যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ শর্তসাপেক্ষে বা নির্দিষ্ট কোনো পরিস্থিতিতে, সময়ে, স্থানে বা পদ্ধতিতে করেছেন বা করতে বলেছেন তাকে ঐসব শর্তসাপেক্ষে বা নির্দেশনা সাপেক্ষে পালন করাই সুন্নাত। যা তিনি উন্মুক্তভাবে বা সাধারণভাবে করেছেন বা করতে বলেছেন, কোনো বিশেষ সময়, স্থান, পরিস্থিতি বা পদ্ধতি নির্ধারণ করেননি তাকে কোনোরূপ বিশেষ পদ্ধতি, সময় বা পরিস্থিতি বা স্থান নির্ধারণ ব্যতিরেকে উন্মুক্তভাবে পালন করাই সুন্নাত।

কোনো কর্ম পালন বা বর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব, পদ্ধতি, ক্ষেত্র, সময়, স্থান ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে সুন্নাতের বেশি বা কম হলে বা সুন্নাতের বাইরে গেলে তা 'খেলাফে সুন্নাত' হবে। অর্থাৎ, যা তিনি ফরয হিসাবে করেছেন তা নফল মনে করে পালন করা, যা তিনি নফল হিসাবে করেছেন তা ফরযের গুরুত্ব দিয়ে পালন করা, যা তিনি সর্বদা নিয়মিতভাবে করেছেন তা মাঝেমধ্যে করা, যা তিনি মাঝে মাঝে করেছেন তা সর্বদা করা, যা তিনি কখনই করেননি তা কখনই না করা, যা তিনি কোনো শর্তসাপেক্ষে বা নির্দিষ্ট কোনো পরিস্থিতিতে, সময়ে, স্থানে বা পদ্ধতিতে করেছেন বা করতে বলেছেন তাকে শর্তহীন উন্মুক্তভাবে পালন করা, যা তিনি উন্মুক্তভাবে বা

[১১৯] সহীহ বুখারী ১/২৭, ৪/১৭৯৩, সহীহ মুসলিম ১/৩৭, ৩৯, ৪০।
[১২০] সূরা আল ইমরান: ৩১ আয়াত।

সাধারণভাবে করেছেন বা করতে বলেছেন, কোনো বিশেষ সময়, স্থান, পরিস্থিতি বা পদ্ধতি নির্ধারণ করেননি তা পালনের জন্য কোনরূপ বিশেষ পদ্ধতি, সময় বা পরিস্থিতি বা স্থান নির্ধারণ করা বা যা তিনি বর্জন করেছেন তা পালন করা সবই 'খেলাফে সুন্নাত'। "খেলাফে সুন্নাত" বা যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ করেননি তা করা এবং তাঁরা যা করেছেন তা বর্জন করা জায়েয হতে পারে, জাগতিকভাবে বা ইবাদত পালনের উপকরণ হিসাবে জরুরিও হতে পারে, তবে কখনই তা ইবাদত, ইবাদতের অংশ বা সাওয়াবের মাধ্যম হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেননি বা বর্জন করেছেন তা করা এবং তিনি যা করেছেন তা বর্জন করাকে দ্বীনের অংশ বা আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ মনে করা নিষিদ্ধ।

(খ). জায়েয ও সুন্নাত

এভাবে দেখছি যে, সুন্নাতের বাইরে কোনো কাজ জায়েয হতে পারে, তবে তাকে উত্তম বা সাওয়াবের মনে করলে, দ্বীনের অংশ মনে করলে বা রীতিতে পরিণত করলে বিদ'আত হবে এবং এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতকে অপছন্দ করা হবে ও কঠিন গোনাহ হবে। যেমন, তাকবীরে তাহরীমায় রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) আল্লাহু আ'যম', 'আল্লাহ মহান' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাহরীমা বাঁধা জায়েয বলেছেন। পশু জবেহ করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত হলো আরবিতে "বিসমিলাহ" বলা। সকল কেতাবে লেখা আছে এবং হানাফী মাযহাবের সকল ইমাম বলেছেন যে, আরবিতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে পারলেও ইচ্ছা করে অন্য যে কোনো ভাষায় 'আল্লাহ', 'প্রভু', 'দয়ালু' ইত্যাদি বললেই জবাই হয়ে যাবে এবং জবাইকারীর কাজটি জায়েয হবে। এখানে জায়েয অর্থ যদি কেউ এভাবে করে তবে তার কাজটি গোনাহের হবে না। কিন্তু যদি কেউ এভাবে এই "জায়েয" কাজতে সুন্নাতের চেয়ে বেশি ভাল বা "তাকওয়া" মনে করে, অথবা সুন্নাত ভাল জেনেও সর্বদা এই "জায়েয" পদ্ধতিতে কাজ করতে থাকে তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। এভাবে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতকে মেরে ফেলবে।

(গ). সুন্নাতের অনুসরণ বনাম উদ্ভাবন ও বিদ'আত

সুন্নাত মেরে ফেলার ও অপছন্দ করার একটি বিশেষ কারণ হলো উদ্ভাবন। সুন্নাতের অনুসরণ অর্থ উপরের নিয়মে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হুবহু ও অবিকল অনুসণে কর্ম করা। হাদীস শরীফে এই হুবহু অনুসরণকে "সুন্নাতের জীবনদান" বলা হয়েছে। কারণ যিনি হুবহু ও অবিকল সুন্নাতের অনুসরণ করেন তিনি রাসূলুলাহ ﷺ এর "রীতি"-কে অবিকল মানুষের মধ্যে প্রচলিত ও জীবিত রাখেন। তিনি যেভাবে পোষাক পরতেন, খানা খেতেন, নামায পড়তেন, যিক্‌র করতেন, কবর যিয়ারত করতেন, দোয়া করতেন, কুরআন পড়তেন অবিকল সেই পদ্ধতিটিই সমাজে জীবিত থাকে।

অনুসরণের বিপরীত "উদ্ভাবন" বা বিদ'আত। বিদ'আত অর্থ রাসূলুলাহ ﷺ -এর সুন্নাত পদ্ধতির বাইরে ইবাদত বন্দেগি পালনের পদ্ধতি। বিদ'আতের পরিচয়, পরিণতি, প্রকরণ ও কারণ সম্পর্কে পূর্বোক্ত বইয়ে আলোচনা করেছি। কোন বিদ'আতই কুরআন ও হাদীসের দলিল ছাড়া বানানো হয় না। সুন্নাত থেকেই বিদ'আতের উদ্ভাবন হয়। উদ্ভাবনের এই প্রক্রিয়া ও উদ্ভাবন ও অনুসরণের মধ্যে পার্থক্য বুঝার জন্য কয়েকটি উদাহারণ পেশ করা যায়।

মনে করুন আমি একজন পীর সাহেবের মুরীদ। আমি দেখতে পেলাম যে আমার পীর মাঝে মাঝে কালো পাগড়ি ও মাঝে মাঝে সাদা পাগড়ি ব্যবহার করেন। আমি ভালোকরে লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম যে, তিনি শুক্রবারে জুম'আর নামাযের জন্য সাদা পাগড়ী ব্যবহার করেন। অন্যান্য দিনে তিনি কালো পাগড়ি ব্যবহার করেন। এখন একজন ভক্ত অনুসারী হিসাবে যদি আমিও হুবহু তাঁর মতো শুক্রবারে সাদা পাগড়ি ও অন্যান্য দিনে কালো পাগড়ি ব্যবহার করি তাহলে আমাকে প্রকৃত ও পরিপূর্ণ অনুসারী বলা হবে। কিন্তু আমি যদি এখানে নিজের বিবেক ও বিবেচনাকে কাজে লাগিয়ে সর্বদা সাদা পাগড়ি ব্যবহার করি তাহলে আমার অন্যান্য পীরভাইগণ স্বভাবতই আমাকে পূর্ণ অনুসারী বলবেন না এবং আমাকে পীরের কর্মের বিরোধিতার জন্য প্রশ্ন করবেন। তাদের প্রশ্নের জবাবে যদি আমি বলি যে, শুক্রবার হচ্ছে সর্বোত্তম দিন এবং এই দিনে আমার পীর সাদা পাগড়ি ব্যবহার করেন। এদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কালো পাগড়ি ব্যবহারের চেয়ে সাদা পাগড়ি ব্যবহারই উত্তম। যদিও পীর নিজে অন্যান্য সকল দিনে কালো পাগড়ি ব্যবহার করেন, তবে তিনি নিজের কর্ম দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, সর্বদা সাদা পাগড়ি ব্যবহারই উত্তম। তাই আমি সর্বদা সকল দিনেই সাদা পাগড়ি ব্যবহার করি। আমার যুক্তি ও দলিল যতই অকাট্য হোক আমার পীর ভাইয়েরা আমাকে পূর্ণ অনুসারী বলে মানবেন না, বরং যিনি পীরের হুবহু অনুকরণ করে শুক্রবারে সাদা পাগড়ি ও অন্য দিনে কালো পাগড়ি পরেন তাকেই হুবহু অনুসরণকারী বলবেন। আমাকে উদ্ভাবনকারী বলবেন। হয়ত কেউ বলবেন, তুমি এভাবে সাদা পাগড়ির ফযীলত আবিষ্কার করলে, অথচ তোমার পীর তা বুঝতে পারলেন না, তুমি কি তাঁর চেয়েও বেশি বোঝ?

এভাবে আমরা অনুসরণ ও উদ্ভাবনের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারছি। আমরা বুঝতে পারছি যে, উদ্ভাবন অনুসরণের বিপরীত। উদ্ভাবনকারী কখনোই পরিপূর্ণ অনুসরণকারী বলে বিবেচিত হবেন না। বরং উদ্ভাবন তাকে অনুসরণের পথ থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরিয়ে নেবে। এজন্য সুন্নাতের অনুসরণ পরিত্যাগের একটি বিশেষ কারণ হলো উদ্ভাবন।

এবার সুন্নাতে নববীর উদাহারণ আমরা বিবেচনা করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষরাতে দীর্ঘক্ষণ তাহাজ্জুদ আদায়ের পরে ফজরের নামাযের পূর্বের দুই রাক'আত সুন্নাত নামায ফজরের আযানের পরে আদায় করতেন। এরপর কখনো আয়েশার (রা.) সাথে কথাবার্তা বলতেন। কখনো ডানকাতে একটু শুয়ে পড়তেন। বেলাল এসে সাড়া দিলে বা একামত দিলে তিনি উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদে জামাতে নামায পড়াতেন।

অন্য কোনো সময়ে সুন্নাত ও ফরয নামাযের মাঝে তিনি শুতেন না। এখন কেউ যদি অবিকল তাঁরই মতো শেষরাতে দীর্ঘক্ষণ তাহাজ্জুদের পড়ে ফজরের আযানের পরে দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় করে ডানকাতে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকেন তাহলে তাকে অবিকল অনুসারী বলা হবে। কিন্তু তিনি যদি ঘরের পরিবর্তে মসজিদে এসে শুয়ে থাকেন অথবা দলবদ্ধভাবে শুয়ে থাকেন তাহলে তাকে অবিকল অনুসারী বলা যাবে না। অনুরূপভাবে যদি কেউ যোহরের সুন্নাতের পরেও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার রীতি চালু করেন তাহলে তাকেও আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবিকল অনুসারী বলতে পারব না। তিনি হয়ত উপরের পদ্ধতিতে অনেক অকাট্য যুক্তি ও দলিল পেশ করতে পারবেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তাঁর কাজকে সুন্নাতের অনুসরণ বলে প্রমাণিত করতে পারবেন না। তাঁকে মানতে হবে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফজরের সুন্নাতের পরে শুয়ে থাকার অনুকরণে যোহরের সুন্নাতের পরে শুয়ে থাকার উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর উদ্ভাবন যত মহানই হোক, সুন্নাতের অনুসরণ প্রেমিক উম্মতের কাছে মনে হবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাল্লাম যোহরের সুন্নাতের পরে কখনো শুতেন না এবং তাঁর সাহাবীগণ শুতেন না। কাজেই যত দলিলই দেখান হোক আমি এই নতুন উদ্ভাবিত রীতির অনুসারী না হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতির অনুসারী হয়েই থাকতে চাই।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক সময় বিশেষ নেয়ামত লাভ করলে বা সুসংবাদ পেলে আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য শুকরানা সাজদা করতেন। এখন যদি কেউ এসকল হাদীসের আলোকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে নিয়মিত একটি করে শুকরানা সাজদা দেওয়ার প্রচলন করেন তাহলে তাকে কখনোই অনুসারী বলা যাবে না। তাকে উদ্ভাবক বলতে হবে। তিনি হয়ত অনেক অকাট্য দলিল পেশ করবেন। তিনি বলবেন, যে কোনো নেয়ামত লাভের পরেই শুকরিয়া সাজদা করা যায়। মুমিনের জীবনের সবচেয়ে বড় নেয়ামত হলো নামায আদায় করতে পারা। কাজেই, এই নেয়ামত লাভের পরে যে শুকরানা সাজদা করে না সে অকৃতজ্ঞ বান্দা। যে বান্দা সন্তান লাভের সংবাদে শুকরিয়া সাজদা করে অথবা চাকরি পাওয়ার সংবাদে শুকরিয়া করে অথচ জীবনের শ্রেষ্ঠ নেয়ামত নামায আদায়ে তৌফিক পেয়ে সাজদা করে না সে কেমন বান্দা !

তিনি হয়ত বলবেন, এই সাজদা যে নিষেধ করে সে বেয়াকুফ, তাকে আবু জাহল বলা উচিত। কারণ সে, আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাতে বান্দাকে নিষেধ করছে। কোথাও কি আছে যে, বিশেষ কোনো নেয়ামতের জন্য সাজদায়ে শুকর আদায় করা যাবে না? রাসূলুলাহ ﷺ কি কখনো নামাযের পরে শুকরানা সাজদা করতে নিষেধ করেছেন ? নেয়ামতের জন্য সাজদা হাদীসে প্রমাণিত। নামায মুমিনের জীবনের অন্যতম নিয়ামত। এছাড়া সাজাদার সময়ে দোয়া কবুল হয় তাও প্রমাণিত। নামাযের পরে দোয়া কবুল হয় তাও প্রমাণিত। কাজেই, প্রত্যেক নামাযের পরে সাজদা করা ও সাজদার মধ্যে দোয়া করা সুন্নাত।

অনেক কথাই তিনি বলতে পারবেন। অগণিত অকাট্য প্রমাণ তিনি প্রদান করবেন। কিন্তু কখনই আমরা তাঁকে সুন্নাতে নববীর অনুসারী বলতে পারব না। কারণ পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত রাসূলুল্লাহ ﷺ আজীবন আদায় করেছেন, তাঁর সাহাবীগণও করেছেন, কিন্তু কেউ কখনোই নামায আদায়ের নেয়ামত লাভের পর শুকরিয়ার সাজদা করেননি। কাজেই, নামাযের পরে শুকরানা সাজদা না করাই তাঁদের সুন্নাত। আর সাজদার প্রথা এই সুন্নাতকে মেরে ফেলবে। অনুকরণপ্রিয় সুন্নাত প্রেমিকের প্রশ্ন হলো : আমরা কি রাসূলুলাহ ﷺ -এর চেয়েও বেশি কৃতজ্ঞ বান্দা হতে চাই? এ সকল অকাট্য দলিলে মাধ্যমে আমরা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকেই অকৃতজ্ঞ ও হেয় বলে প্রমাণিত করছি না?

(ঘ) সুন্নাতের অনুসরণের গুরুত্ব

রাসূলুলাহ ﷺ এর অনুসরণই ইসলাম। ইসলাম অর্থ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুসরণে আল্লাহর ইবাদত করা। কেউ তাঁর অনুসরণের বাইরে মনগড়াভাবে আল্লাহর ইবাদত করলে সে মুসলিম বলে গণ্য হবে না। বেলায়াত ও ইহসানের পথে চলতে সুন্নাতের হুবহু অনুকরণ অতি আবশ্যক। এর অনেক ফযীলত, মর্যাদা ও গুরুত্বের কথা কুরআন ও হাদীসে বলা হয়েছে। এখানে সামান্য কয়েকটি দিক উল্লেখ করছি।

(১). সুন্নাতের অনুসরণই রহমতের ও ক্ষমার একমাত্র ওসীলা। আল্লাহ বলেছেন: "বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। বলুন, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুত যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না।"[১২১]

(২) সুন্নাতের অনুসরণ ইবাদত কবুলের শর্ত। রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন: "আমাদের (অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের) এ কাজের (ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের) মধ্যে যে নতুন কোনো বিষয় উদ্ভাবিত করবে তার নতুন উদ্ভাবিত কাজটি প্রত্যাখ্যান করা হবে।" সহীহ মুসলিমের বর্ণনায়: "আমাদের কর্ম যা নয় এমন কোনো কর্ম যদি কোনো মানুষ করে তাহলে তার কর্ম প্রত্যাখ্যাত হবে (আল্লাহর নিকট কবুল হবে না)।"[১২২]

(৩) সুন্নাতের অবিকল অনুসরণ ও জীবনদানকারী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে জান্নাতে থাকতে পারবে। রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন: "য আমার সুন্নাতকে জীবিত করবে (পালন ও প্রচারের মাধ্যমে আমার সুন্নাতকে জীবিত, প্রচলিত বা প্রতিষ্ঠিত রাখবে), সে আমাকেই

[১২১] সূরা আল-ইমরান-৩১,৩২ আয়াত।
[১২২] সহীহ বুখারী, কিতাবুস সুলহ, নং ২৪৯৯, সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আকদিয়া, নং ৩২৪২, ৩২৪৩।

ভালবাসবে। আর যে আমাকে ভালবাসবে, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"[১২৩] তিনি আরো বলেছেন: "যে ব্যক্তি হালাল খাদ্য খেয়ে জীবনযাপন করবে, সুন্নাত অনুসারে আমল করবে এবং কোনো মানুষ তাঁর দ্বারা কষ্ট পাবে না, সে ব্যক্তি জান্নাতী হবে।" একজন সাহাবী প্রশ্ন করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ, এ ধরনের মানুষতো আজকাল অনেক। তিনি বললেন : আমার অনেক যুগ পরেও আমার উম্মতের মধ্যে এরূপ মানুষ থাকবে।[১২৪]

(৪) সুন্নাত অনুসারে অল্প ইবাদতেই অনেক বেশি সাওয়াব। হাসান বসরী বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :"সুন্নাতের মধ্যে অল্প আমল করা বিদ'আতের মধ্যে অনেক আমল করার চেয়ে উত্তম। যে আমার পদ্ধতির অনুসরণ করবে সে আমার উম্মত, আমার সাথে সম্পর্কিত। আর যে আমার পদ্ধতি অপছন্দ করবে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"[১২৫]

(৫) জান্নাতের বিশেষ সুসংবাদ। অনেক সময় বিভিন্ন সমাজে ইবাদতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে যায় এবং খেলাফে সুন্নাত পদ্ধতিতে ইবাদত পালন করা হয়। সেই সময় কোন মুমিন যদি উঠে যাওয়া ও ভুলে যাওয়া সুন্নাত অনুসারে ইবাদত পালন করেন এবং সুন্নাতকে জীবিত ও প্রচলিত করেন তাহলে তাঁর জন্য রয়েছে বিশেষ সাওয়াব। রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন: "ইসলামের শুরু হয়েছে অনাত্মীয় বান্ধবহীন প্রবাসীর মতো এবং তেমনি আত্মীয়হীন বান্ধবহীন রূপেই ইসলাম ফিরে আসবে। এই বান্ধবহীন স্বজনহীন ইসলামের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদ"। যাঁরা আমার পরে মানুষেরা আমার যেসকল সুন্নাত নষ্ট করবে তা ঠিক করবে।"[১২৬]

(ঙ) বিভিন্ন ইবাদত বন্দেগি বিষয়ক কিছু সুন্নাত ও খেলাফে সুন্নাত

আমি এখানে আমাদের সমাজে প্রচলিত অনেক ইবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত ও আমাদের প্রচলিত খেলাফে সুন্নাত বা সুন্নাত বিরোধী পদ্ধতি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। এখানে শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ কি করেছেন এবং কি করেন নি তা উল্লেখ করছি। যা করেছেন তা সুন্নাত এবং যা করেন নি তা খেলাফে সুন্নাত। খেলাফে সুন্নাত জায়েয কি না এ বিষয়টি আমাদের কাছে গৌণ। আমাদের চেষ্টা করতে হবে যথা সম্ভব সুন্নাত অনুসারে চলার। এখানে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করছি। বিস্তারিত জানার জন্য পাঠককে "এহইয়াউস সুনান" গ্রন্থটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি। এছাড়া তিলাওয়াত, দরুদ সালাম, দোয়া-মুনাজাত ইত্যাদি বিষয়ক সুন্নাত ও খেলাফে সুন্নাত বিস্তারিত জানার জন্য "রাহে বেলায়াত" পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

(১) নামায রোযা ইত্যাদি বিষয়ক কিছু সুন্নাত ও খেলাফে সুন্নাত

এবিষয়ক অনেক কথা এই বইয়ে করা হয়েছে। বিশেষভাবে বলা যায়: তাহাজ্জুদ নামায মোটেও না পড়া খেলাফে সুন্নাত রীতি। তাহাজ্জুদের জন্য জামাত করা বা কোনো সূরা নির্ধারণ করে নেওয়া খেলাফে সুন্নাত রীতি। সাধ্যমত কিছু তাহাজ্জুদ আদায় করা এবং সুবিধা মত যতবড় সম্ভব সূরা পাঠ করাই সুন্নাত। শবে কদর ও অন্যান্য রাতের নামায আদায়ের জন্যও একই নিয়ম। এজন্য বিশেষ কোনো সুরা নির্ধারণ করা খেলাফে সুন্নাত।

নফল রোযা আদায়ের ক্ষেত্রে সুন্নাত দিন ও পদ্ধতি উপরে আলোচনা করেছি। শবে মেরাজের দিনে রোযা রাখা ফযীলতে কেনো হাদীস নেই। এই দিনে বিশেষকরে রোযা রাখা খেলাফে সুন্নাত। শবে বরাতের দিনে রোযা রাখার হাদীসটি খুবই দুর্বল। শবে বরাতের নামায সমবেতভাবে আদায় করা, জাকজমকের সা রাতটি পালন করা, রুটি তৈরি ও বিতরণ করা, কবরে আলো দেওয়া সবই খেলাফে সুন্নাত কাজ।

(২) দোয়া-মুনাজাত বিষয়ক কিছু সুন্নাত ও খেলাফে সুন্নাত

দোয়ার ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে নিজের জাগতিক ও পারলৌকিক ছোটবড় সকল বিষয় চাওয়া। বিপদে পড়ে দোওয়া না করে তাওয়াক্কুল করা কঠিন অন্যায় ও খেলাফে সুন্নাত। না চাইলে আল্লাহ অসন্তুষ্ঠ হন। বিপদে ও অভাবে পড়লে মানুষের কাছে না জানিয়ে আল্লাহর কাছে জানানো সুন্নাত। দোয়ার সুন্নাতের মধ্যে রয়েছে:

১) দোয়ার আগে কিছু নেক আমল করা, বিশেষত কিছু যিক্‌র, তাসবীহ, আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর সালাত পাঠ করা।

২) গভীর মনোযোগের সাথে দোয়া করা। হৃদয় থেকে সকল অবলম্বন দূর করে শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে মনকে রুজু করা। অসহায় ও কাতর হৃদয়ের দোয়া আল্লাহ কবুল করেন।

৩) দোয়া আল্লাহ কবুল করবেন এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করা। কখনোই একথা মনে না করা যে, আমি অনেক দোয়া করেছি, বোধহয় কবুল হলো না, বা বোধহয় কবুল হবে না। এরূপ চিন্তা করা গোনাহের কাজ এবং এতে দোয়া কবুলের পথ বন্ধ হয়ে যায়।

৪) ছোট বড় সকল বিষয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।

---

[১২৩] সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, নং ২৬০২। তিনি হাদীসটিকে হাসান ও গরীব বলেছেন।
[১২৪] সুনানে তিরমিযী, কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ, নং ২৫২০।
[১২৫] আব্দুর রাজ্জাক সানআনী, আল-মুসান্নাফ ১১/২৯১, নং ২০৫৬৮। ।
[১২৬] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, নং ১৪৫, সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, নং ২৬৩০।

৫) দোয়া কবুলের সময়ের ও স্থানের দিকে লক্ষ্য রাখা। হাদীসের আলোকে শেষ রাতে, ফরয নামাযের পরে, কুরআন খতমের সময়, বৃষ্টির সময়, জিহাদের ময়দানে কাতারবদ্ধ হওয়ার সময় ও সফরের সময় দোয়া কবুল হয়। অনুরূপভাবে কাবাঘরের পাশে, সাফা মারওয়ার উপরে ও আরাফার মাঠের দোয়া কবুল করেন।

দোয়ার জন্য হাত উঠানো

সাধারণভাবে দোয়া বা মুনাজাতের জন্য দু হাত তুলে আবেগের সাথে দোয়া করা ভাল। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কোনো দোয়ার সময় হাত উঠাতেন ও কখনো উঠাতেন না। তিনি বৃষ্টির জন্য দোয়ার সময়, আরাফাতের মাঠে দোয়ার সময়, যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার সময় ও অন্যান্য কোনো কোনো বিশেষ আবেগের সময়ে দোয়ার জন্য তিনি হাত তুলতেন। এরূপ যে সকল সময়ে তিনি হাত উঠিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে সেখানে হাত উঠানো সুন্নাত বলে গণ্য হবে। অপরদিকে অধিকাংশ সময় হাত না-উঠিয়ে শুধু মুখে দোওয়া করতেন। যেখানে ও যে সময়ে তিনি হাত উঠাননি বলে জানা গিয়েছে সেখানে হাত না-উঠানো সুন্নাত। অধিকাংশ মাসনূন দোয়া এই প্রকারের। ইস্তিঞ্জার আগে ও পরে, কাপড় পরিধান বা খোলার সময়, ওযুর পরে, মসজিদে গমনের পথে, মসজিদে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময়, আযানের পরে দোয়া পাঠের সময়, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরের দোয়া পাঠের সময়, নতুন চাঁদ দেখে, ইফতারের সময় ইত্যাদি অগণিত মাসনূন দোয়া মুনাজাত পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ দুই হাত তুলে দোয়া-মুনাজাত করতেন না। তাঁরা স্বাভাবিক অবস্থায় হাত না উঠিয়ে মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে মুনাজাত আদায় করতেন। এ সকল ক্ষেত্রে এভাবে দোয়া করাই সুন্নাত। বাকি সকল ক্ষেত্রে হাত উঠানো বা না-উঠানোর কোন সুন্নাত নির্ধারিত নেই। এ সকল সাধারণ ক্ষেত্রে সাধারণ ফযীলতের হাদীসের আলোকে আমরা হাত উঠাতে পারি। কিন্তু এ সকল হাদীস দিয়ে বিশেষ পদ্ধতি বা রীতি তৈরি করতে পারি না। বিশেষত সাধারণ ফযীলতের হাদীস দিয়ে সুন্নাত বিরোধী রীতি তৈরি করার অর্থ "সুন্নাত" অপছন্দ করা।

দোয়ার জন্য সমবেত হওয়া

দোয়া বিষয়ক খেলাফে সুন্নাতের একটি হলো দোয়ার জন্য সমবেত হওয়া। শুধুমাত্র দোয়ার জন্য সমবেত হওয়া খেলাফে-সুন্নাত। তবে যিক্র, আলোচনা, তিলাওয়াত বা অন্য কোনো শরীয়ত সঙ্গত কারণে একত্রিত হলে সেখানে দোয়া করা যেতে পারে।

বানোয়াট দোয়ার ওযীফা

রাসূলুলাহ ﷺ থেকে বিভিন্ন দোয়া বর্ণিত হয়েছে। দোয়ার সময় এসকল শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা উত্তম। যে কোনো ভাষায় ও যে কোনো শব্দে দোয়া করলেই দোয়ার ইবাদত পালন হবে। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যবহৃত বা শেখানো শব্দ ব্যবহার করলে দোয়ার ইবাদত ছাড়াও তাঁর অনুসরণের ইবাদত পালন করা হবে। এছাড়া এতে কবুলিয়তের সম্ভাবনা বাড়ে ও মহব্বত বৃদ্ধি পায়। "গাইর মাসনূন" বা সুন্নাতের বাইরে কোনো আলেম বা বুজুর্গ লিখিত দোয়াকে সর্বদা পাঠ করা বা রীতি করে নেওয়া খেলাফে-সুন্নাত।

এছাড়া আমাদের সমাজে অনেক মিথ্যা ও বানোয়াট দোয়া হাদীসের নামে প্রচলিত। এগুলির মধ্যে অন্যতম: 'হাফত হাইকাল', 'দোয়া গঞ্জল আরশ', 'দোয়া আহাদ নামা', 'দোয়া হাবীবী', 'হিযবুল বাহার', 'দোয়া কাদাহ', 'দোয়া জামীলা', 'রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুবারাক নামসমূহের ওযীফা', 'দরুদে আকবার', 'দরুদে লাখী', 'দরুদে হাজারী', 'দরুদে তাজ', 'দরুদে তুনাজ্জিনা', 'দরুদে রুহী', 'দরুদে শেফা', 'দরুদে নারীয়া', 'দরুদে গাওসিয়া', 'দরুদে মুহাম্মাদী'। এধরণের অগণিত বানোয়াট বা মানব রচিত দোয়া বানোয়াট চটকদার ফলাফলের কাহিনী সহ বিভিন্ন "আমল", "ওযীফা", "যিক্র" বা "নামায শিক্ষা" গ্রন্থে প্রচারিত হচ্ছে। এগুলির কিছু পুরোটাই বানোয়াট এবং কিছু মাসনূন দোয়ার সাথে খেলাফে সুন্নাত দোয়ার সংমিশ্রণ। সর্বাবস্থায় এগুলির মধ্যে কোনো নবুয়তের নূর নেই। এছাড়া এ জাতীয় অনেক দোয়ার মধ্যে আপত্তিকর, আদবের খেলাফ বা শিরকমূলক শব্দও রয়েছে। সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো বা পালিত শব্দ বাদ দিয়ে এগুলির নিয়মিত আমল নিঃসন্দেহে সুন্নাতের প্রতি অবহেলা।

জীবিত কারো কাছে দোয়া চাওয়া

জীবিত কারো কাছে দোয়া চাওয়া সুন্নাত সম্মত। তবে একে রীতিতে পরিণত করা ভাল নয়। অনেক সাধারণ মুসলিম সাধারণত নিজের জন্য নিজে আল্লাহর দরবারে দোয়া চাওয়ার চেয়ে অন্য কোনো বুজুর্গের কাছে দোয়া চাওয়াকেই বেশি উপকারী বলে মনে করি। পিতামাতা, উস্তাদ, আলেম নেককার কোনো জীবিত মানুষের কাছে দোয়া চাওয়া জায়েয, আমাদের বুঝতে হবে যে, নিজের দোয়া নিজে করাই সর্বোত্তম। আমরা অনেক সময় মনে করি, আমরা গোনাহগার, আমাদের দোয়া কি আল্লাহ শুনবেন? আসলে গোনাহগারের দোয়াই তো তিনি শুনেন। আমার মনের বেদনা, আকুতি আমি নিজে আমার প্রেমময় প্রভুর নিকট যেভাবে জানাতে পারব সেভাবে কি অন্য কেউ তা পারবেন। এছাড়া এই দোয়া আমার জন্য সাওয়াব বয়ে আনবে এবং আমাকে আল্লাহর প্রেম ও করুণার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আয়েশা (রা.) বলেন : আমি প্রশ্ন করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল, সর্বোত্তম দোয়া কি?" তিনি উত্তরে বলেন : دعاء المرء لنفسه "মানুষের নিজের জন্য নিজে দোয়া করা"[১২৭]

সাহাবীগণ রাসূলুলাহ ﷺ -এর কাছে দোয়া চাইতেন। তাবেয়ীগণও সাহাবীগণের কাছে মাঝেমধ্যে দোওয়া চাইলে তাঁরা দোয়া করতেন। অপরদিকে তাঁরা এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি বা অতিভক্তি নিষেধ করতেন। অনেক সাহাবী কেউ দোয়া চাইলে বলতেন: আমি কি নবী নাকি যে, সবার জন্য দোয়া করতে হবে বা আল্লাহ আমরা দোয়া কবুল করবেনই। তুমি তোমার নিজের জন্য দোয়া কর।

---

[১২৭] মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৫২।

অন্যের কাছে দোয়া চাওয়া পরিত্যাগ করলে কোনো গোনাহ হবে না। আল্লাহ দয়া করে নেককার মানুষের দোয়া কবুল করতে পারেন। কিন্তু যদি কেউ চিন্তা করে যে, অমুক ব্যক্তি দোয়া করলেই আল্লাহ কবুল করবেন বা অমুক ব্যক্তির দোয়াই বিপদ উদ্ধারের কারণ তাহলে সে অতিভক্তি বা শিরকের মধ্যে নিপতিত হয়ে যাবে। অথবা বুজর্গগণের নিকট দোয়া চাওয়ার জন্য যদি কেউ নিজের জন্য নিজে দোয়া করার মাসনূন রীতি পরিত্যাগ করে, কোনো বিপদ, পাপ বা সমস্যায় পতিত হলেই দৌড় নেককার মানুষদের কাছে চলে যায় তাহলে সে শুধু বিদ'আতেই লিপ্ত হবে না, উপরন্তু অফুরন্ত সাওয়াব ও মহান প্রভুকে আবেগভরে ডাকার বা প্রার্থনা করার অশেষ নেয়ামত ও আত্মিক প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত হবে।

দোয়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। দোয়ায় রত ব্যক্তি নামায, রোযা বা যিকিরে রত ব্যক্তির মতোই যতক্ষণ দোয়ায় রত থাকবেন ততক্ষণ অগণিত ও অফুরন্ত সাওয়াব পেতে থাকবেন। সর্বোপরি দোয়া মহান প্রভুর সাথে বান্দার যোগাযোগ। যে কোনো দোয়া বান্দার হৃদয়ে এনে দেয় মহান প্রভুর রহমতের অপার্থিব ছোঁয়া ও অনাবিল আনন্দ। এসকল নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হন ঐ ব্যক্তি যিনি নিজের দোয়া নিজে করার চেয়ে বেশি সময় ও আবেগ ব্যয় করেন অন্যের কাছে দোয়া চাওয়ায়। আজকাল অধিকাংশ মুসলিম এই ক্ষতির মধ্যে নিপতিত।

আমাদের সর্বদা নিজের জন্য নিজে প্রভুর দরবারে দোয়া করতে হবে। যত গোনাহগার হই-না কেন, আমি তাঁরই বান্দা। তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল। দোয়া কবুল হোক বা না-হোক, কবুলের আশা, আবেগ ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে নিয়ে সর্বদা দোয়া করতে হবে। এর পাশাপাশি কোনো নেককার মানুষের কাছে দোয়া চাওয়া যেতে পারে।

কোন মৃত ব্যক্তির কাছে দোয়া চাওয়া

আমাদের দেশে অনেক মুসলিমের মধ্যে প্রচলিত একটি রীতি হলো কোনো মৃত বুজুর্গ, ওলী বা আলেমের কাছে দোয়া চাওয়া বা তাঁকে অনুরোধ করা যে, আপনি আমার জন্য আল্লাহ কাছে দোয়া করুন। এই কর্মটি সম্পূর্ণ সুন্নাত-বিরোধী ও জঘন্য বিদ'আত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনোই কোন মৃত নবী বা ওলীর কবরে যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চান নি। সাহাবীগণ কখনোই কোন নবী, ওলী বা বুজুর্গের কবরে যেয়ে তাঁদের কাছে দোয়া চান নি। এমনকি সকল ওলীর সরদার, আল্লাহর হাবীব, সাহাবীগণের চোখের মনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রওযা মুবারাকায় যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাওয়ার রীতিও সাহাবীগণের মধ্যে ছিল না। পরিপূর্ণ ভক্তি ও মহব্বতের সাথে যিয়ারত ও সালামের রীতি ছিল তাঁদের মধ্যে। সাহাবীগণ বিভিন্ন সমস্যায় পড়েছেন, যুদ্ধবিগ্রহ করেছেন বা বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। কখনোই খুলাফায়ে রাশেদীন বা সাহাবীগণ দলবেঁধে বা একাকী রাসূলুল্লাহর ﷺ রওযা মুবারাকে যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাননি।

আবু বকর (রা) খিলাফত গ্রহণের পরেই কঠিনতম বিপদে নিপতিত হয় মুসলিম উম্মাহ। একদিকে বাইরের শত্রু, অপরদিকে মুসলিম সমাজের মধ্যে বিদ্রোহ, সর্বোপরি প্রায় আধা ডজন ভণ্ড নবী। মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বের সংকট। কিন্তু একটি দিনের জন্যও আবু বকর (রা) সাহাবীগণকে নিয়ে বা নিজে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রওযায় যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাননি। এমনকি আল্লাহর কাছে দোয়া করার জন্যও রওযা শরীফে সমবেত হয়ে কোনো অনুষ্ঠান করেননি। কী কঠিন বিপদ ও যুদ্ধের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন আলী (রা)। অথচ তাঁর সবচেয়ে আপনজন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রওযায় যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাননি।

অনুরূপভাবে পরবর্তীতে যুগগুলিতে তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ কখনো পূর্ববতী কোনো মৃত নবী, ওলী, সাহাবী বা তাবেয়ীর কবরে যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চান নি। সিহাহ সিত্তা ও হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থ খুঁজে দেখুন। এ জাতীয় কোনো ঘটনা পাবেন না।

আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়ার জন্য কারো মাজারে যাওয়া

অনেকে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে কোনো কবরে চলে যান। ওলী আউলিয়াগণের কবরে, তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানে, তাঁদের জন্ম, মৃত্যু বা অন্য কোনো স্মৃতি বিজড়িত সময়ে দোয়া করার জন্য তাঁরা বিশেষভাবে আগ্রহী। অনেক মুসলমানের বদ্ধমূল ধারণা, ওলী বুজুর্গগণের মাযারে যেয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলে দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়। তাঁদের এই চিন্তা ও কর্ম খেলাফে সুন্নাত, জঘন্য বিদ'আত ও শিরকের মধ্যে নিপতিত হওয়ার অন্যতম পথ। আল্লাহর কাছে নিজের হাজত প্রয়োজন চাওয়ার জন্য মাজারে যাওয়া সুন্নাত বিরোধী বিদ'আত রীতি। বিভিন্ন হাদীসে দোয়া কবুলের সময় ও স্থানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কখনো কোথাও বলা হয়নি যে, ওলী আল্লাহগণের কবরে দোয়া করলে আল্লাহ তাড়াতাড়ি কবুল করবেন। কখনো রাসূলুলাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ কোনো মাজারে বা কবরে দোয়া করতে যাননি। সুন্নাতের শিক্ষার বাইরে কোনো স্থানে বা সময়ে দোয়া করাকে কবুলের মাধ্যম মনে করা, বা সুন্নাতের শিক্ষার বাইরে কোনো স্থানে বা সময়ে দোয়া করার রীতি গ্রহণ করা খেলাফে-সুন্নাত ও বিদ'আত।

আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে প্রার্থনা করা খেলাফে-সুন্নাত ও শিরক

অনেক নামধারী মুসলিম বিপদে আপদে আল্লাহকে না ডেকে বা আল্লাহর কাছে সাহায্য না চেয়ে বিভিন্ন ওলী-আওলিয়াকে ডাকতে থাকেন ও তাঁদের কাছে প্রার্থনা করেন। এগুলি খেলাফে সুন্নাত ও শিরক। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ, তাবে-তাবেয়ীগণ কখনো কোনো অবস্থায় আল্লাহ ছাড়া কোনো ফিরিশতা, নবী, ওলী, সাহাবী, তাবেয়ী বা অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করেননি। কখনোই কোনো সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রওযায় যেয়ে বলেননি যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার হায়াত বাড়িয়ে দিন, সন্ত ান দিন, বিপদ কাটিয়ে দিন,... ইত্যাদি। কখনো তাঁরা কোনো বিপদে, যুদ্ধে, কষ্টে, দুঃখে বলেননি যে, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে বা আমাদেরকে বাঁচান'।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ কখনো জামাতবদ্ধ ভাবে বা সমবেত ভাবে মুনাজাত করেন নি। প্রত্যেকে সুযোগ ও সময় অনুসারে ব্যক্তিগতভাবে যিক্‌র ও মুনাজাতে রত থাকতেন। এছাড়া জানাযার নামাযের পরে মুনাজাতও খেলাফে সুন্নাত বিদ'আত। গায়েবানা জানাযার রীতি খেলাফে সুন্নাত।

(৩) কুরআন তিলাওয়াত বিষয়ক কিছু সুন্নাত ও খেলাফে সুন্নাত

কুরআন তিলওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের অন্যতম সুন্নাত হলো: নিয়মিত তিলাওয়াত করা। থেমে থেমে টেনে টেনে ভক্তি ও ভালবাসার সাথে তিলাওয়াত করা। বুঝে পড়া। ৩ দিনের কমে খতম না করা। ৭ দিনে বা একমাসে খতম করা। যথাসম্ভব বেশি পরিমাণ বা পুর্ণ কুরআন মুখস্থ করা। অর্থ অনুধাবন করা। কুরআনের নির্দেশ অনুসারে জীবন পরিচালনা করা। কুরআন তিলাওয়াত, হিফজ, অনুধাবন ও পালন শিক্ষা দান করা।

কুরআন তিলাওয়াতের খেলাফে-সুন্নাত

(১) কুরআনের প্রতি অবহেলা ও কুরআন তিলাওয়াত না করা। আমরা অনেক বই, পুস্তক বা সংবাদ পত্র পড়ি, কিন্তু আমাদের পাঠ্য তালিকায় আল্লাহর কেতাব নেই! কী অদ্ভুত মুসলমান আমরা ! সবচেযে আশ্চার্য বিষয় হলো অনেক ধার্মিক মুসলমানও কুরআন পাঠ করতে পারেন না, করেন না এবং এজন্য কোনো বেদনাও অনুভব করেন-না। কোনো খেলাফে সুন্নাত বিদ'আতে পরিণত হওয়ার একটি কারণ হলো খেলাফে-সুন্নাতকে রীতি হিসাবে গ্রহণ করা বা খেলাফে-সুন্নাাতকে সুন্নাতের চেয়ে ভালো বলে মনে করা। এধরনের দুইট বিদ'আত আমাদের মধ্যে রয়েছে : (১) কুরআন তিলাওয়াত বাদ দিয়ে শুধুমাত্র অন্যান্য যিক্‌রকে ওযীফা করে নেওয়া ও (২) কুরআন কারীম পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র অন্যান্য কেতাবাদি থেকে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করা।

(২). আংশিক তিলাওয়াত। অর্থাৎ কুরআনের ২/৪টি সূরা নিয়মিত ওযীফা হিসাবে তিলাওয়াত করা, বাকি কুরআন তিলাওয়াত না-করা। কিছু সুরা দিয়ে ওযীফা তৈরি করে সেগুলি সর্বদা পড়া এবং বাকি কুরআন না পড়া।

(৩). বুঝার চেষ্টা না করে শুধু তিলাওয়াতের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা। অনেক ধার্মিক মুসলমান সারা জীবনই না-বুঝে পড়ার রীতি তৈরি করে নিয়েছেন। বিশেষত যেখানে মাতৃভাষায় বিভিন্ন তরজমা ও তাফসীর সহজপ্রাপ্য সেখানে এই অবহেলা কুরআন কারীমের সাথে বেয়াদবী ও আল্লাহর কালামের প্রতি অবহেলা। এছাড়া এই অবহেলা ও সুন্নাত বর্জনকে রীতিতে পরিণত করে আমরা বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত হয়েছি।

অনেক মুসলমান এই বিদ'আত রীতিকে কুরআন বুঝার মাসনূন ইবাদতের চেয়ে উত্তম ও নিরাপদ মনে করেন। অনেকে ভাবেন যে, কুরআনের তরজমা বা তফসীর করতে গিয়ে হয়ত আলেমের ভুল হতে পারে, কাজেই তরজমা ও তাফসীর পাঠের চেয়ে মানুষের লেখা অন্যান্য বই ও বইয়ের তরজমা পড়ে ইসলাম শেখা উত্তম।

কী অপূর্ব বিচার! কুরআনের ব্যাখ্যায় ভুল হতে পারে অথচ কুরআন, হাদীস ও ফিকহের আলোকে বই লিখলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই! কুরআনের তরজমার ক্ষেত্রে সবই আল্লাহর বাণীর তরজমা, হয়ত বা দুই একটি স্থানে বুঝার ভুল হতে পারে। আর অন্যান্য ইসলামী বই পুস্তক যারা লিখেছেন তাঁরা ভুলেভরা মানুষ, অন্যান্য ভুলেভরা মানুষের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উদ্ধৃতি বুঝতেও ভুল হতে পারে। অন্য একজন তার তরজমা করেছেন। তরজমাতেও ভুল হতে পারে। অগণিত ভুলের সম্ভাবনা। তা সত্ত্বেও মুসলমান কুরআনের তাফসীর ও তরজমা পাঠের চেয়ে মানুষের লেখা বইয়ের তরজমা পড়তে ভালবাসেন!

(৪). রাতারাতি খতম, সবীনা খতম কুরআনের সাথে বেআদবীমূলক একটি বিদ'আত। একরাতে খতম করা খেলাফে সুন্নাত। এজন্য মাইক ব্যবহার অতিরিক্ত গোনাহ ও পাপের কাজ। কুরআন তিলাওয়াত ও শোনা ইবাদত। পরিপূর্ণ মহব্বত, আন্তরিকতা, ভয় ও ভক্তিসহ তিলাওয়াতে যেমন সাওয়াব, শুনলেও তেমনি সাওয়াব। কেউ যদি এভাবে তিলাওয়াত করেন এবং তাঁর কাছে বসে অন্য কিছু মানুষ তা শুনেন তাহলে তা নিঃসন্দেহে সাওয়াবের কাজ। কিন্তু অমনোযোগিতার সাথে, খেলাধুলা, গল্পগুজবের মধ্যে তিলাওয়াত করা বা শোনা অত্যন্ত বেয়াদবী। বেশি উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াতও বেয়াদবী। এছাড়া কুরআন তিলাওয়াত, যিক্‌র, দোয়া ইত্যাদি নফল ইবাদতের জন্য কাউকে বিরক্ত করা, কারো ঘুম, নামায বা অন্যান্য কাজ নষ্ট করা একেবারেই না-জায়েয। এতে 'হক্কুল ইবাদ' বা মানুষের অধিকার নষ্ট করার জন্য কঠিন হারাম ও কবীরা গোনাহ হবে।

কেউ যদি কুরআন খতম, শোনা ও শোনানোর ইবাদত পালন করতে চান তবে তার উচিত হবে যে, কোনো মুত্তাকী হাফেজকে ডেকে আদবের সাথে বসিয়ে তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করা। সেখানে তিনি নিজে ও অন্যান্য আগ্রহী মানুষ বসবেন। যতক্ষণ হৃদয়ের আগ্রহ ও ভক্তি থাকবে ততক্ষণ তিলাওয়াত ও শ্রবণ অব্যাহত থাকবে। ক্লান্তি আসলে কিছুক্ষণ তা বন্ধ রেখে পরে আবার শুরু করতে হবে। এভাবে কমপক্ষে তিন দিনে কুরআন খতম করতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে, আনুষ্ঠানিকতা ইবাদত নয়, ভক্তি, ভালবাসা, আন্তরিকতাই ইবাদত। পরিপূর্ণ ভক্তি ও ভালবাসা নিয়ে অল্প তিলাওয়াত ও শ্রবণ অন্তরহীন প্রাণহীন অগণিত খতমের চেয়ে অগণিতবার উত্তম।

(৪) যিক্‌র বিষয়ক কিছু সুন্নাত ও খেলাফে সুন্নাত

সর্বদা যিকিরে ঠোঁট নাড়াতে থাকা, বিশেষ করে সকালে, বিকালে সন্ধ্যায় রাতে যিক্‌র করা ইত্যাদি সুন্নাত বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। যিকিরের সুন্নাত হলো মনে মনে বা মৃদু শব্দে আদায় করা। সমবেতভাবে, সমস্বরে, জোরে জোরে, লাফালাফি করে, গজলের সাথে সুর করে, হু, হু করে ইত্যাদি পদ্ধতিতে যিক্‌র করা খেলাফে সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নাম ধরে ডেকে যিক্‌র করা খেলাফে সুন্নাত। এতে শিরক হতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো "ইল্লাল্লাহ" জপ করে যিক্‌র করেন নি বা শুধু "আল্লাহ, আল্লাহ" জপ

করে যিক্‌র করেননি। যিকিরের মাজলিসে বেশি বেশি আল্লাহর মহব্বত, ভয় ও তাওবা উদ্রেককারী আলোচনা ও প্রত্যেকে নিজেনিজে মৃদু স্বরে যিক্‌র- ইস্তিগফার করা সুন্নাত। সমবেতভাবে সমস্বরে যিক্‌র খেলাফে সুন্নাত।

(৫) দরুদ ও সালাম বিষয়ক কিছু সুন্নাত ও খেলাফে সুন্নাত

রাসূলুলাহ ﷺ -এর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করা অত্যন্ত বড় নেক কর্ম। এর অগণিত ও অফুরন্ত সাওয়াব রয়েছে। দরুদ-সালাম পাঠের সুন্নাতের মধ্যে রয়েছেঃ

প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় এবং ঘুমানর আগে, আযানের পরে, যেকোনো অবস্থায় তাঁর নাম শুনলে, শুক্রবার দিনে বেশি বেশি, যে কোনো দোয়ার আগে পরে ও মাঝে, মসজিদে প্রবেশের ও বাহির হওয়ার সময় দরুদ পাঠ করা সুন্নাত। যেকোনো মাজলিসে, মাহফিলে, আসরে, যেখানেই দু'এক জন মুসলমান একত্রিত হবেন, তাদের প্রত্যেকেরই উচিৎ মাঝে মাঝে কিছু দরুদ পাঠ করা। অন্তত আলোচনা বা মাজলিস ভাঙ্গার আগেই ২/১ বার আল্লাহ যিক্‌র ও দরুদ পাঠ না করা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। এছাড়া সদা সর্বদা ও সর্ববস্থায় যত বেশি সম্ভব দরুদ ও সালাম পাঠ করা সুন্নাতের নির্দেশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম লিখার সময় পরিপূর্ণভাবে দরুদ ও সালাম লিখতে হবে। অনেকে কৃপণতা করে শুধুমাত্র '(দ:)' বা '(স:)' লিখেন। এভাবে লিখা উচিত নয়।

দরুদ সালামের সুন্নাত-পদ্ধতিসমূহ

রাসূলুলাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত হলো সদা সর্বদা আল্লাহর যিক্‌র ও দরুদ সালাম আদায় করা। এমনকি নাপাক অবস্থায় বা গোসল ফরয থাক অবস্থায়ও তাঁরা আল্লাহর যিক্‌র, দোয়া ও দরুদ পাঠ করতেন। এক্ষেত্রে তাঁরা কোনো বিশেষ পদ্ধতি বা নিয়ম নির্ধারণ করেননি। বসে থাকলে বসে বসে, দাঁড়িয়ে থাকলে দাঁড়িয়ে, শুয়ে থাকলে শুয়ে তাঁর সালাত ও সালামের ইবাদত আদায় করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের সুন্নাতের বিশেষ দিক হলো তাঁরা সর্বদা ব্যক্তিগতভাবে সালাত ও সালাম আদায় করতেন। সকল নফল ইবাদতের মতোই যিক্‌র, সালাত ও সালামের সুন্নাত-পদ্ধতি হলো জামাতে বা সমবেতভাবে তা আদায় না-করা। তাঁরা মাজলিসে বসা অবস্থায় সালাত ও সালাম পাঠ করতেন, তবে জামাতে অর্থাৎ সমস্বরে বা একত্রে নয়, বরং প্রত্যেকে নিজের মতো।

দরুদ- সালামের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুন্নত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে

দরুদ ও সালাম আদায়ে অবহেলা করা। সমস্বরে, বানানো শব্দে বা পদ্ধতিতে দরুদ ও সালাম আদায় করা। খেলাফে-সুন্নাত সময়ে দরুদ-সালাম পাঠের রীতি বানান। বিশেষত যেসকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের নির্দিষ্ট সুন্নাত রয়েছে সেক্ষেত্রে, যেমন খাওয়ার আগে, পরে, আযানের আগে, নামাযের আগে, জায়নামাযে দাঁড়ানোর সময়ে, পশু জবাই করার সময়। ঈদের নামাযের পরে সমবেত দরুদ সালাম পাঠ করাও খেলাফে সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ কখনো দরুদ সালাম পাঠের জন্য "মীলাদ মাহফিল" নামে সমবেত হননি। তাঁরা যিকিরের মাহফিল, সুন্নাতের মাহফিল, হাদীসের মাহফিল ইত্যাদি নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবন ও সুন্নাত আলোচনা করতেন এবং তাঁর উপর প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে দরুদ ও সালাম পাঠ করতেন। সালাম পাঠের জন্য কখনোই তাঁরা উঠে দাঁড়াতেন না।

(৬) জানাযা, দাফন ও কবর বিষয়ক কিছু সুন্নাত ও খেলাফে সুন্নাত

মৃত্যুর পরে যথাশীঘ্র দাফন করা সুন্নাত। দাফনের পরে কবরের কাছে আযান, তিলাওয়াত ইত্যাদি খেলাফে সুন্নাত। কবরে ফুল দেওয়া খেলাফে সুন্নাত ও ইহুদি নাসারাদের অনুসরণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত হলো কবর কাঁচা রাখা বা মাটির রাখা। কবর বাঁধানো, পাকা করা, কবরের উপরে ঘর, গম্বুজ ইত্যাদি বানানো, কবরের উপরে গেলাফ দেওয়া একদিকে খেলাফে সুন্নাত ও অপরদিকে নিষিদ্ধ হারাম। রাসূলুলাহ ﷺ এ সকল কাজ করতে বারংবার নিষেধ করেছেন এবং কোথাও কোনোভাবে অনুমতি দেন নি। কোথাও তিনি বা কোনো সাহাবী বলেননি যে, কোনো ওলী, বুজুর্গ বা কোনো মানুষের কবর বাঁধালে কোনো প্রকার সাওয়াব হবে বা তা'যীম হবে। কোনো সাহাবী কখনো কোনো ওলী-বুজুর্গের কবর বাঁধাননি, গেলাফ দেন নি বা গম্বুজ বানান নি। বরং সকলেই বারংবার নিষেধ করেছেন এবং কবর বাঁধালে বা উচু করলে ভেঙ্গে ফেলেছেন।

(৭) কুলখানী, যিয়ারত ইত্যাদি বিষয়ক কিছু সুন্নাত ও খেলাফে সুন্নাত

মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সফলতা, মুক্তি, শান্তি ও নেয়ামত লাভের ইচ্ছা ও চেষ্টা সকল ধর্মের অনুসারিগণই করেন। এই জাতীয় সকল কর্ম একান্তই ধর্মীয় ও বিশ্বাসভিত্তিক। বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধর্মহীনতা ও অজ্ঞানতার প্রসারের ফলে এ বিষয়ে অনেক কুসংস্কার ও উদ্ভট ধারণা বিরাজমান। যেমন, অনেক সমাজে মনে করা হয়, মৃতের জীবত আত্মীয়স্বজনের দান, খাদ্য প্রদান বা কিছু অনুষ্ঠান পালনের উপরে মৃতব্যক্তির পারলৌকিক মুক্তি নির্ভরশীল।

ইসলামে এ সকল কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মানুষের পারলৌকিক মুক্তি, শান্তি ও সফলতা নির্ভর করে তার নিজের কর্মের উপরে। সৎকর্মশীল মানুষের মৃত্যুর পরে বিশ্বের কোথাও কিছু না করা হলে, এমনকি তাঁর দেহের সৎকার করা না হলেও তাঁর কিছুই আসে যায় না। অপরদিকে জীবদ্দশায় যিনি শিরক, কুফর, ইসলাম বিরোধিতা, ইসলামের বিধিনিষেধের ও ইসলামী কর্ম ও আচরণের প্রতি অবজ্ঞা, জুলুম, অত্যাচার, অবৈধ উপার্জন, ফাঁকি, ধোঁকা ইত্যাদিতে লিপ্ত থেকেছেন তার জন্য তার মৃত্যুর পরে বিশ্বের সকল মানুষ একযোগে সকল প্রকার 'শ্রাদ্ধ', অনুষ্ঠান, 'প্রার্থনা' ইত্যাদি করলেও তার কোনো লাভ হবে না।

তবে যদি কোনো ব্যক্তি বিশুদ্ধ ঈমানসহ ইসলামের ছায়াতলে থেকে সৎকর্ম করে মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে জীবিত ব্যক্তিগণ তাঁর জন্য প্রার্থনা করলে প্রার্থনার কারণে দয়াময় আল্লাহ তাঁর সাধারণ অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন বা তাকে সাওয়াব ও করুনা দান করতে পারেন।

এছাড়া এই ধরনের মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে কোনো জীবিত মানুষ দান বা জনকল্যাণমূলক কর্ম করলে সেই কর্মের সাওয়াব করুনাময় আল্লাহ উক্ত মৃতব্যক্তিকে প্রদান করতে পারেন। এই ধরনের কর্মকে সাধারণত আরবিতে "ঈসালে সাওয়াব" ও ফারসিতে "সাওয়াব রেসানী" বলা হয় যার অর্থঃ সাওয়াব পৌঁছানো। কুরআন কারীমে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। হাদীস শরীফে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা, দোয়া ও দান-সদকা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের উদ্দেশ্যে জীবিত ব্যক্তির এ সকল কর্মের সাওয়াব তাঁরা লাভ করবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া মৃতের দায়িত্বে হজ্জপালন বাকি থাকলে তা তাঁর পক্ষ থেকে পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মৃত ওলী, বুজুর্গ বা আপনজনের জন্য দোয়া, দান, সাওয়াব রেসানী বা ঈসালে সাওয়াবের ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো ব্যক্তিগতভাবে সদাসর্বদা দোয়া করা এবং সুযোগ সুবিধা ও আগ্রহ অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের জন্য দান-সাদকা ও হজ্ব ওমরা বা কুরবানি করা। বিশেষত তাঁদের সাওয়াবের উদ্দেশ্যে স্থায়ী জনকল্যাণ মূলক কাজ করা। যেমন, জমি ওয়াকফ করা, পানির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। সুযোগমত কোনো প্রকারের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া তাঁদের কবর যিয়ারত করে তাঁদেরকে সালাম দেওয়া ও তাঁদের জন্য দোওয়া করা।

সকল প্রকার আনুষ্ঠানিকতা, ৩ দিন, ৭ দিন, ৪০ দিন, মৃত্যুদিন, জন্মদিন বা অনির্ধারিত কোনো দিনে খানাপিনা, দোয়ার অনুষ্ঠান, কুরআন খতম, কালেমা খতম ইত্যাদি সকল আনুষ্ঠানিকতা খেলাফে সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের পরে প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণ একটিবারও তাঁর কুলখানী, ইসালে সাওয়াব, ওরস ইত্যাদি উপলক্ষ্যে তাঁর ওফাত দিনে বা অন্য কোনো দিনে, কোনো রকম দিন নির্ধারণ করে বা না-করে, মদীনায় বা অন্য কোথাও কখনোই কোনো অনুষ্ঠান, সমাবেশ, মাহফিল, খানাপিনা কিছুই করেননি। পরবর্তী যুগের মুসলিমগণও এগুলি করেন নি। শেষ যুগে ফারসি, তুর্কি ও ভারতীয় ধর্ম ও রীতির প্রভাবে এগুলি মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে।

(৮) কবর যিয়ারত বিষয়ক কিছু সুন্নাত ও খেলাফে সুন্নাত

কবর যিয়ারত একটি সুন্নাত ইবাদত। এর সুন্নাত পদ্ধতি হলো মৃত্যুর কথা স্মরণ ও মৃতের জন্য দোয়া করার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা। কবরের কাছে যেয়ে মৃতকে সালাম দেওয়া ও সংক্ষেপে তাঁর জন্য দোয়া করা। আর এক্ষেত্রে খেলাফে সুন্নাত হলো মাজার বা কবরের বরকত লাভের জন্য, মাজারে যেয়ে আল্লাহকে ডাকার জন্য বা দোয়া করার জন্য যিয়ারতে যাওয়া। কবর যিয়ারতের সময় কবরের কাছে কোনো প্রকার দান, সাদকা, খানাপিনা, ঈসালে সাওয়াব, সাওয়াব রেসানী, ওরস ইত্যাদি সবই খেলাফে সুন্নাত।

কখনো কোনো সাহাবী, তাবেয়ী বা তাবে-তাবেয়ী মৃত্যু দিবস, জন্মদিবস হিসাব করে যিয়ারত করতে যাননি। যিয়ারত উপলক্ষে কবরে কোনো অনুষ্ঠান, আয়োজন, মানত বিতরণ বা শিরণী বিতরণ করেননি। গরু, ছাগল, উট, হাঁস, মুরগী, ফল, ফসল, শিরণী, মিঠাই, ফুল, ফুলের তোড়া ইত্যাদি সাথে নিয়ে যিয়ারতে যাননি। যিয়ারতের সময় দোয়ার পূর্বে তাঁরা কোনো কুরআন খানী, নির্দিষ্ট সূরা পাঠ, দরুদ সালাম পাঠ, দোয়া কালেমা পাঠ ইত্যাদি কোনো কিছুই করেননি। একটি সহীহ সনদের ঘটনাও নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণের তাঁর ইন্তেকালের পরে খিলাফতের রাশেদার ৩০ বৎসরে অথবা তার পরেও সাহাবীগণের প্রায় শতাব্দীকালের মধ্যে একবারও তাঁর রওযা মুবারক যিয়ারতের জন্য বা বাকী' গোরস্থানে "ওলীকুল শিরোমনি" উম্মুল মু'মিনীন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রী, সন্তান ও বংশধরগণ বা সাহাবীগণের কবর যিয়ারতের জন্য এ সকল অনুষ্ঠান করেছেন বা এ সব কিছু নিয়ে যিয়ারত করতে গিয়েছেন, বা কোনো প্রকারে ওরস ইত্যাদি পালন করেছেন।

(৯) তাবাররুক ও তাযীম বিষয়ক কিছু সুন্নাত ও খেলাফে সুন্নাত

নেককার মানুষ বা ওলী-বুজুর্গগণকে ভালবাসা ও ভক্তি করা সুন্নাতের নির্দেশ। এক্ষেত্রে সুন্নাতী উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে খুশি করা। যেহেতু তিনি আল্লাহর অনুগত বান্দা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতের অনুসারী, সেহেতু আমি তাঁকে ভালবাসি ও ভক্তি করি, যেন আল্লাহ খুশি হন। এই ব্যক্তির কাছে আমার কোনো চাওয়া- পাওয়া নেই। কোনো ক্ষমতাও তাঁর নেই। তবে আমি জানি যে, আল্লাহর গোলামী ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে লিপ্ত মানুষকে ভালবাসলে আল্লাহ খুশি হন, তাই ভালবাসি। এজন্য যে পদ্ধতিতে এ সকল মানুষকে ভালবাসতে ও সম্মান করতে আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূল (ﷺ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেই পদ্ধতিতে তাঁদের ভালবেসে ও সম্মান করে আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি অর্জন করে ধন্য হতে চাই।

আর সুন্নাত বিরোধী শিরকী উদ্দেশ্য হলো উক্ত ব্যক্তিকে খুশি করা। একথা মনে করা যে, এই "ওলী" ব্যক্তি আমাদের কোনো অলৌকিক কল্যাণ বা অকল্যাণের মালিক। তাঁকে সম্মান ও ভক্তি করলে তাঁর অলৌকিক প্রভাবে আমার বিপদ কেটে যাবে বা রোগ সেরে যাবে। আমি নেককর্ম করি বা না-করি তাঁকে ভক্তি করলে তিনি আমাকে পরকালে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। কাজেই যেভাবে পারি, হাতে ধরে, পায়ে ধরে, সুন্নাত অনুসারে বা সুন্নাতের বাইরে, যেভাবে পারি একে খুশি করতে পারলেই আমার উদ্দেশ্য হাসিল হবে। যদি কেউ এই ধরনের কোনো চিন্তা নিয়ে "ওলী"-কে সম্মান করেন তাহলে তিনি একজন মুশরিক। তিনি ভক্তির নামে একজন মানুষকে আল্লাহর সাথে তাঁর ক্ষমতা ও গুণাবলীতে শরীক বানিয়েছেন।

অপরদিকে ওলীর তা'যীমের ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবেয়ীগণের সুন্নাত পদ্ধতি হলো, তাঁরা জীবিত বুজুর্গদের সাহচর্য পছন্দ করেছেন, তাঁদেরকে ভালবেসেছেন, তাঁদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মৃত্যুর পরে তাঁদেরকে দাফন করেছেন। সাধারণত এলাকার

গোরস্থানে অন্য সকল মুসলমানদের সাথে তাঁরা তাঁদের দাফন করতেন। সুযোগমতো তাঁদের কবর যিয়ারত করেছেন ও তাঁদের জন্য দোয়া করেছেন।

বুজুর্গগণের সাহচর্য লাভের জন্য পীরের কাছে যায় মুসলমান। পীরের কাছে যাওয়ার সুন্নাত সম্মত উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর পথে চলার জ্ঞানার্জন ও পালনের প্রেরণা লাভ। আর খেলাফে সুন্নাত উদ্দেশ্য হলো জাগতিক প্রয়োজনে, হাজত পূরণের জন্য, নিজে আমল না করে পীরের আমলের উপর নির্ভর করে আখেরাতে মুক্তি পাওয়ার জন্য বা অনুরূপ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে পীরের কাছে যাওয়া।

বরকত মনে করে পীরবজুর্গের স্মৃতিবিজড়িত স্থানে, বাড়িতে বা কবরে খালিপায়ে যাওয়া, এসকল স্থানোর মাটি, ধুলা, পানি ইত্যাদি সংরক্ষণ করা, বরকত মনে করা, এসকল স্থানের মাছ, কুমির, গরুছাগল, গাছপালা ইত্যাদিকে বরকতময় মনে করা, এগুলির গায়ের ময়লা সংগ্রহ করা ইত্যাদি সবই খেলাফে সুন্নাত ও শিরকমূলক কর্ম। রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবী, তাবেয়ী ও প্রথম যুগের মুসলিমগণ কখনই এসকল কর্ম করেন নি। তাঁরা সর্বদা বুজুর্গগণের অনুসরণের মাধ্যমে বরকত লাভের চেষ্টা করতেন।

জীবিত ও মৃত ওলী ও বুজুর্গের সম্মানের একটি বিশেষ দিক হলো তাঁদের জন্য উপাধি ব্যবহার করা। এক্ষেত্রে সুন্নাত হলো কোনো প্রকার উপাধি ব্যবহার না করা। সাহাবীগণ রাসূলুলাহ ﷺ -কে তাঁর জীবদ্দশায় ডাকতে সর্বদা (ইয়া রাসূলালাহ) ও (ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ) বলেই তাঁকে সম্বোধন করতেন। তাঁকে সম্বোধন করে তাঁদের হৃদয় নিংড়ানো ভক্তি ও ভালবাসা জানাতে তাঁরা অনেক সময় বলতেন : فداك أبي وأمي "আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবানি হউন"। (ইয়া হাবীবালাহ), (ইয়া খলীলালাহ) ইত্যাদি বলার প্রচলন তাঁদের মধ্যে ছিল না, যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন হাদীসে জানিয়েছেন যে, তিনি আল্লাহর হাবীব ও খলীল। তাঁকে সম্বোধনের সময় 'সাইয়্যেদানা', 'মাওলানা' ইত্যাদি ভক্তি বা মর্যাদা-জ্ঞাপক উপাধি তাঁরা ব্যবহার করতেন না। যদিও কাউকে 'সইয়্যেদুনা', 'মাওলানা' ইত্যাদি বলার রেওয়াজ তাঁদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং এগুলির ব্যবহার না-জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই বলেছেন যে, তিনিই মানবকুলের নেতা বা সাইয়্যেদ। সাহাবীগণ শাহাদতের জন্য বা তাঁর উপর সালাত সালাম প্রেরণ করতে তাঁর নাম নিতেন। যেমন- হে আল্লাহ, মুহাম্মাদের উপর সালাত পাঠান, আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের উপর সালাত প্রেরণ করুন। আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদের উপর সালাত প্রেরণ করুন। সালাত প্রেরণের ক্ষেত্রে তাঁর নামের আগে (সাইয়্যেদানা), (হাবীবানা), (মাওলানা), (শাফিয়ানা) ইত্যাদি উপাধি ব্যাবহরের নিয়ম প্রচলিত ছিল না।

অন্য কারো কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উল্লেখ করতে হলে সাহাবীগণ সাধারণত তাঁর উপাধি (রাসূলুল্লাহ) ও (নাবিয়্যুল্লাহ) বলে তাঁর উল্লেখ করতেন। যেমন বলতেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নবী ﷺ বলেছেন, নবীয়্যুল্লাহ ﷺ বলেছেন বা করেছেন ইত্যাদি। কখনো কখনো তাঁরা অন্যের কাছে তাঁর উল্লেখ করতে তাঁর নাম উল্লেখ করতেন।

এই ছিল রাসূলুলাহ ﷺ -এর ক্ষেত্রে তাঁদের রীতি। আর অন্য সকল বুজুর্গ সাহাবীগণের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের রীতি ছিল সম্বোধনের সময় কুনিয়াত ধরে ডাকা। অর্থাৎ, (অমুকের পিতা) বলে ডাকতেন। আর তাঁদের উল্লেখ করার সময় নাম ধরে উল্লেখ করতেন।

রাসূলুলাহ ﷺ বা অন্য কোন সাহাবী বা বুজুর্গকে ডাকার জন্য বা তাঁর নাম বলার জন্য নামের পূর্বে বা পরে হযরত, হুজুর, কেবলা, বাবা, বাবাজান, আব্বাজান, খাজা ইত্যাদি কোনো সম্মানসূচক শব্দ তাঁরা ব্যবহার করতেন না। আর আমাদের দেশের প্রচলিত অগণিত আল্লাহর নৈকট্য জ্ঞাপক উপাধি তাঁরা কখনো ব্যবহার করেননি। গাওস, কুতুব ইত্যাদি শব্দের তো কোনো অস্তিত্বই ছিল না। মুহিউস সুন্নাহ, কামেউল বিদ'আত, ইমামুল আইম্মাহ, মুজাদ্দিদে যামান, গওস, গাওসে আ'জম, গাওসে সাকালাইন, ওলীয়ে কামেল, হাদীয়ে জামান, কুতুব, কুতুবে রাব্বানী, কুতুবে দাওরান, কুতুবে এরশাদ, খাজা, আশেকে রাসূল, ওলীকুল শিরোমনি, সূফী সম্রাট, মাহবুবে ইলাহী, মাহবুবে সোবহানী, কেবলা, কাবা ইত্যাদি ইত্যাদি অগণিত উপাধির কোনোকিছুই তাঁরা কখনোই ব্যবহার করেননি। কারো জীবদ্দশায় তো নয়ই, এমনকি কারো মৃত্যুর পরেও তাঁর নামের সাথে কোনো উপাধি তাঁরা ব্যবহার করতেন না। তাঁরা নামের পরে (রাহিমাহুল্লাহ) ইত্যাদি দোয়া বলতেন।

কে আল্লাহর সত্যিকার ওলী, মুত্তাকী বা কার ইবাদত আল্লাহ কবুল করেছেন তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। এজন্য কাউকে ওলী, ওলীয়ে কামেল, ওলীয়ে বরহক ইত্যাদি উপাধি ব্যবহার কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ অনুসারে নিষিদ্ধ। এছাড়া খাজায়ে খাজেগান, সূফীকুল সম্রাট, ওলীকুল শিরোমনি, সকল ওলীর শ্রেষ্ঠওলী, শাহেনশাহে তরীকত ইত্যাদি উপাধি শুধু নিষিদ্ধই নয় উপরন্তু অত্যন্ত বেয়াদবীমূলক। এসকল উপাধি শুধুমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ ﷺ-এর জন্য। যদি নবীগণকে বাদ দিয়ে অন্য মুমিনগণকেও বুঝানো হয়, তাহলেও এই উপাধিগুলি শুধুমাত্র সাহাবীগণের প্রাপ্য।

বেলায়াত, ওয়াসীলাহ ও ইহসানের কিছু কর্ম

যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা, সেহেতু একে আংশিকভাবে, কাটছাঁট করে বা সংক্ষিপ্ত করে পালন করা যায় না। আল্লাহর পথে চলার অর্জনের উপরের আটটি পর্যায়ের কর্মগুলিকে কাটছাঁট করে কম করারও কোন উপায় নেই। ঈমানের বিশুদ্ধতা, হালাল উপার্জন, হারাম বর্জন ও ফরয পালনের ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি, অবহেলা বা অবজ্ঞাকে অনুমোদন করার কোনরকম সুযোগ নেই। অনিচ্ছাকৃত ভুলভ্রান্তি ও মানবীয় দুর্বলতা জনিত অপরাধের জন্য তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে, তবে সেগুলিকে মুমিন হালকাভাবে দেখতে পারেন না বা অনুমোদন করতে পারেন না।

ফরয পালনের পরে "নফল" কর্মের পর্যায়। এ পর্যায়ের কর্মের ক্ষেত্রে বাছবিচার ও অগ্রাধিকার প্রদানের সুযোগ রয়েছে। কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, কিছু কিছু "নফল" ইবাদত সহজ সাধ্য কিন্তু তার মর্যাদা ও সাওয়াব খুবই বেশী। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, "ইত্তিবায়ে সুন্নাত" এমন একটি সহজ কিন্তু সর্বোচ্চ বেলায়াত অর্জনের পথ। আমরা এখানে এ জাতীয় আরো কিছু "নফল" ইবাদতের কথা উল্লেখ করছি। এগুলির পরিপূর্ণ সাওয়াব ও বরকত লাভ করতেও প্রত্যেক ইবাদতের ক্ষেত্রে ইত্তিবায়ে সুন্নাতের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১. নফল সালাত, সিয়াম, সাদাকাহ ও হজ্জ

ইতঃপূর্বে আমরা এগুলির বিষয়ে আলোচনা করেছি।

২. যে কোনো মানুষ বা প্রাণীর উপকার করা

আলাহর রহমত, বরকত ও সাওয়াব অর্জনের সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ হলো আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি, বিশেষত মানুষের প্রতি কল্যাণ ও উপকারের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। সকল জাগতিক প্রয়োজনে সাহায্য করা, সমাজের কিছু মানুষের মধ্যে পরস্পরে গোলমাল বা অশান্তি হলে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, সেবা করা, বিপদে পড়লে উদ্ধার করা, মাযলূম হলে সাহায্য করা, মৃত্যুবরণ করলে কাফন-দাফনে শরীক হওয়া ইত্যাদি সকল প্রকার মানব সেবামূলক কাজের জন্য অকল্পনীয় সাওয়াব ও মর্যাদার কথা অগণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছেঃ যে ব্যক্তি দরিদ্রদেরকে সাহায্য করবে, অসুস্থদের দেখাশুনা করবে, মৃতব্যক্তির দাফনে শরীক হবে ও নফল রোযা পালন করবে সে ব্যক্তি জান্নাতী। যতক্ষণ একজন মানুষ অন্য কোনো মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ তার কল্যাণে রত থাকবেন। বিধবা ও এতিমদের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি এ সেবার মাধ্যমে সারারাত তাহাজ্জুদ, সারাদিন নফল রোযা ও আল্লাহর পথে জিহাদের সাওয়াব অর্জন করবে। অনাথ বা এতিমদের যিনি দেখাশুনা করেন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে পাশাপাশি জান্নাতে স্থান পাবেন। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নেক আমল কোনো মুসলিমের হৃদয়ে আনন্দ প্রবেশ করান, তার বিপদ বা উৎকণ্ঠা দূর করা, তার ঋণ আদায় করা অথবা তার ক্ষুধা দূর করা। কোনো ভাইয়ের কাজে তার সাথে একটু হেঁটে যাওয়া মসজিদে এক মাস ইতেকাফ করার চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের সাথে যেয়ে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে কেয়ামতের দিনে যেদিন সকলের পা পিছলে যাবে সেদিন আল্লাহ তার পা সুদৃঢ় রাখবেন। ... এইরূপ অগণিত হাদীস আমরা হাদীসের গ্রন্থে দেখতে পাই।[১২৮]

৩. সবাইকে ভালবাসা এবং হৃদয়কে বিদ্বেষ মুক্ত করা

হৃদয়কে বিদ্বেষ, হিংসা, অন্যের অমঙ্গল কামনা ইত্যাদি কলুষিত কর্ম থেকে মুক্ত রাখা এমন একটি কর্ম যা মানুষকে অতিরিক্ত নফল ইবাদত ও যিক্‌র আযকার ছাড়াই জান্নাতের অধিকারী করে তোলে। আনাস (রা.) বলেন, "একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে বসে ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি বললেন : এখন তোমাদের এখানে একজন জান্নাতী মানুষ প্রবেশ করবেন। তখন একজন আনসারী মানুষ প্রবেশ করলেন, যাঁর দাড়ি থেকে ওযুর পানি পড়ছিল এবং তাঁর বাম হাতে তাঁর জুতাজুড়া ছিল। পরের দিনও রাসূলুল্লাহ ﷺ একই কথা বললেন এবং একই ব্যক্তি প্রবেশ করল। তৃতীয় দিনেও রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম দিনের মতোই আবারো বললেন এবং আবারো একই ব্যক্তি প্রবেশ করল। তৃতীয় দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মজলিস ভেঙ্গে চলে গেলে আব্দুল্লাহ ইবনু উমর উক্ত আনসারী ব্যক্তির পিছে পিছে যেয়ে বলেন, আমি আমার পিতার সাথে মন কষাকষি করেছি এবং তিন রাত বাড়িতে যাব না বলে কসম করেছি। সম্ভব হলে এই কয় রাত আপনার কাছে থাকতে দিবেন কি ? তিনি রাজি হন। (আব্দুল্লাহর ইচ্ছা হলো তিন রাত তাঁর কাছে থেকে তাঁর ব্যক্তিগত ইবাদত জেনে সেই মতো আমল করা, যেন তিনিও জান্নাতী হতে পারেন)। তিনি তিন রাত তাঁর সাথে থাকেন, কিন্তু তাঁকে রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করতে বা বিশেষ কোনো নফল ইবাদত পালন করতে দেখেন না। তবে তিন দিনের মধ্যে তাঁকে শুধুমাত্র ভালো কথা ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোনো খারাপ কথা বলতে শোনেননি। আব্দুল্লাহ বলেন, আমার কাছে তাঁর আমল খুবই নগণ্য মনে হতে লাগল। আমি বললাম : দেখুন, আমার সাথে আমার পিতার কোনো মনোমালিন্য হয়নি। তবে আমি পরপর তিনি দিন রাসূলুলাহ ﷺ-কে বলতে শুনলাম এখন একজন জান্নাতী মানুষ আসবেন এবং তিনবারই আপনি আসলেন। এজন্য আমি আপনার আমল দেখে সেইমতো আমল করার উদ্দেশ্যে আপনার কাছে তিন রাত্র কাটিয়েছি, কিন্তু আমি আপনাকে বিশেষ কোনো আমল করতে দেখলাম না! তাহলে কী কর্মের ফলে আপনাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতী বললেন ? তিনি বললেন : তুমি যা দেখেছ এর বেশি কোনো আমল আমার নেই, তবে আমি আমার অন্তরের মধ্যে কোনো মুসলমানের জন্য কোনো অমঙ্গল ইচ্ছা রাখি না এবং আমি কোনো কিছুর জন্য কাউকে হিংসা করি না। তখন আব্দুল্লাহ বলেন : এই কর্মের জন্যই আপনি এই মর্যাদায় পৌঁছাতে পেরেছেন।"[১২৯]

---

[১২৮] মুনযিরী, আত-তাগীব ৩/৩৪৬-৩৫১, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/১৯১, সহীল জামিয়িস সাগীব ১/৯৭।

[১২৯] মুসনাদু আহমদ ৩/১৬৬, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/২১৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৭৮-৭৯, মাকদিসী, আল-আহাদীসুল মুখতারাহ ৭/১৮৭, ইবনু আব্দিল বার, আত-তামহীদ ৬/১২১।

অন্য হাদীসে হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন, "বেটা, যদি পার তবে এমনভাবে সকাল ও সন্ধ্যা করবে (জীবন কাটাবে) যে, তোমার হৃদয়ে কারো প্রতি কোনো বিদ্বেষ বা অমঙ্গল ইচ্ছা নেই। সম্ভব হলে এইরূপ চলবে, কারণ এইরূপ চলা আমার সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আর যে আমার সুন্নাতকে জীবিত করল, সে আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসবে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"[১৩০]

পাঠক হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন যে, সংঘাতপূর্ণ জীবনে অনেক মানুষ আমাদেরকে কষ্ট দেন, হক্ব নষ্ট করেন, ক্ষতি করেন বা শত্রুতা করেন। অনেকে অকারণেও এগুলি করেন। এদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা থেকে হৃদয়কে কিভাবে বিরত রাখব? আসলে বিষয়টি কঠিন বলেই তো সাওয়াব বেশি। তবে চেষ্টা করলে তা কঠিন থাকে না। মানবীয় স্বভাবের কারণে আমাদের মনে বিশেষ মুহূর্তে ক্রোধ, কষ্ট বা বিরক্তি আসবেই। তবে মনটা একটু শান্ত হলেই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মনের মধ্য থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর কাছে নিজের জন্য ও যার কর্মে বা ব্যবহারে আমরা কষ্ট পেয়েছি তার জন্য ইস্তিগফার করতে হবে ও দোয়া করতে হবে।

প্রয়োজনে নিজের হক্ব রক্ষার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তবে অধিকার আদায়ের চেষ্টা বা কর্ম আর মনের হিংসা ও শত্রুতা এক নয়। এক ব্যক্তি আমার অধিকার নষ্ট করেছেন, আমি তার নিকট থেকে আমার অধিকার আদায়ের চেষ্টা করছি। কিন্তু তার সাথে আমার কোনো শত্রুতা নেই। আমি আমার অধিকার ফেরৎ পাওয়া ছাড়া তার কোনো প্রকার অমঙ্গল কামনা করি না। বরং আমি সর্বদা তার জন্য দোয়া করি। এভাবে হৃদয়কে অভ্যস্ত করলে ইন্‌শা আল্লাহ আমরা উপরিউক্ত সাহাবীর মতো হতে পারব এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত জীবিত করার সাওয়াব অর্জন করতে পারব।

অন্যায়ের ঘৃণা বনাম হিংসা ও অহংকার

আরেকটি বিষয় আমাদেরকে সমস্যায় ফেলে দেয়। আমরা জানি যে, শিরক, কুফর, বিদ'আত, হারাম, পাপ ইত্যাদিকে ঘৃণা করা ও যারা এগুলিতে লিপ্ত বা এগুলির প্রচার প্রসারে লিপ্ত তাদেরকে ঘৃণা করা আমাদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ঈমানী দায়িত্ব। আমরা এই দায়িত্ব ও হৃদয়কে মুক্ত রাখার মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সাধন করব?

এই বিষয়টিকে শয়তান অন্যতম ফাঁদ হিসাবে ব্যবহার করে, যা দিয়ে সে অগণিত ধার্মিক মুসলিমকে হিংসা, হানাহানি, আত্মতৃপ্তি ও অহংকারের মত জঘন্যতম কবীরা গোনাহের মধ্যে নিপতিত করছে। এই ফাঁদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সংক্ষেপে নিম্নের বিষয়গুলি স্মরণ রাখতে হবে।

প্রথমত, পাপ অন্যায়, জুলুম অত্যাচার, শিরক, কুফর, বিদ'আত বা নিফাককে অপছন্দ বা ঘৃণা করতে হবে বা অপছন্দ করতে হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে ও তাঁর প্রদত্ত গুরুত্ব অনুসারে। তিনি যে পাপকে যতটুকু ঘৃণা করেছেন, নিন্দা করেছেন বা যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন ততটুকু গুরুত্ব দিতে হবে। তাঁর পদ্ধতি বা সুন্নাতের বাইরে মনগড়াভাবে ঘৃণা করলে তা হবে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ইসলামের নামে নিজের ব্যক্তি আক্রোশ বা অহংকারকে প্রতিষ্ঠা করা ও শয়তানের আনুগত্য করা।

এই ক্ষেত্রে বর্তমানে অধিকাংশ ধার্মিক মানুষ কঠিন ভুলের মধ্যে নিপতিত হন। কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত কঠিন পাপগুলিকে আমরা ঘৃণা করি না বা বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করি না, কিন্তু যেগুলি কোন পাপ নয় বা কম ভয়ঙ্কর পাপ সেগুলি নিয়ে প্রচণ্ড হানাহানি ও হিংসা বিদ্বেষে নিপতিত হই। ইতিপূর্বে আমি ইসলামের কর্মগুলির পর্যায় আলোচনা করেছি এবং এগুলিকে আটটি পর্যায়ে ভাগ করেছি। একুট চিন্তা করলেই দেখতে পাবেন যে, আমাদের সমাজের ধার্মিক মুসলিমদের দলাদলি, হানাহানি, গীবতনিন্দা ও অহঙ্কারের ভিত্তি হলো শেষ দুইতিনটি পর্যায়ের সুন্নাত-নফল ইবাদত। আমরা কুফর, শিরক, হারাম উপার্জন, মানুষের ক্ষতি, সৃষ্টির অধিকার নষ্ট, ফরয ইবাদত ত্যাগ ইত্যাদি বিষয়ে তেমন কোন আলোচনা, আপত্তি, বিরোধিতা বা ঘৃণা করি না। অথচ সুন্নাত নফল নিয়ে কি ভয়ঙ্কর হিংসা ঘৃণার সয়লাব।

ফরয সালাত যে মোটে পড়ে না, তার বিষয়ে আমরা বেশি চিন্তা করি না, কিন্তু যে সুন্নাত সালাত আদায় করল না, বা সালাতের মধ্যে টুপি বা পাগড়ী পরল না, অথবা সালাতের শেষে মুনাজাত করল বা করল না, অথবা সালাতের মধ্যে হাত উঠালো বা উঠালো না ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা হানাহানি ও অহঙ্কারে লিপ্ত রয়েছি। এই জাতীয় কয়েকটি উদাহারণ আমি "রাহে বেলায়াত" গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। সেগুলি ও আমাদের জীবনের অন্যান্য বিষয় থেকে পাঠক সহজেই বুঝবেন যে, এ বিষয়ে আমরা শয়তানের ফাঁদে আষ্টেপৃষ্টে আটকা পড়েছি।

দ্বিতীয়ত, এ ঘৃণা একান্তই আদর্শিক ও ঈমানী। ব্যক্তিগত জেদাজেদি, আক্রোশ বা শত্রুতার পর্যায়ে যাবে না। আমি পাপটিকে ঘৃণা করি। পাপে লিপ্ত মানুষটিকে আমি খারাপে লিপ্ত বলে জানি। তিনি যখন তা পরিত্যাগ করবেন তখন তিনি আমার প্রিয়জন হবেন। আমি তার জন্য দোয়া করি যে, আল্লাহ তাকে পাপ পরিত্যাগের তাওফীক দিন।

তৃতীয়ত, ঘৃণা ও বিরোধিতার অর্থ হিংসা নয়। ভালবাসার সাথে এ ঘৃণা একত্রিত থাকে। মা তার মলমূত্র জড়ানো শিশুকে দেখে নাক শিটকায়। ভাই তার অপরাধে লিপ্ত ভাইকে ঘৃণা করে। কিন্তু এ ঘৃণার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে ভালবাসা। মূলত ব্যক্তি শিশু বা ব্যক্তি ভাইকে ঘিরে থাকে তার সীমাহীন ভালবাসা, আর তার গায়ে জড়ানো ময়লা বা অপরাধকে ঘিরে থাকে ঘৃণা। সাথে থাকে তাকে ঘৃণিত বিষয় থেকে মুক্ত করার আকুতি।

---

[১৩০] সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৬, নং ২৬৭৮।

চতুর্থত, ঘৃণা ও অহংকার এক নয়। আমি পাপকে ঘৃণা করি। পাপীকে অন্যায়কারী মনে করি। পাপের প্রসারে লিপ্ত ব্যক্তিকে ঘৃণা করি। কিন্তু এগুলির অর্থ এই নয় যে, আমি আমার নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে অমুক পাপীর চেয়ে উন্নত, মুত্তাকী বা ভাল মনে করি। নিজেকে কারো চেয়ে ভাল মনে করা তো দূরের কথা নিজের কাজে তৃপ্ত হওয়াও কঠিন কবীরা গোনাহ ও ধ্বংসের কারণ। আমি জানি না যে, আমার ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হচ্ছে কিনা, আমি জানি না আমার পরিণতি কী আর উক্ত পাপীর পরিণতি কী, কিভাবে আমি নিজেকে অন্যের চেয়ে ভাল মনে করব?

পঞ্চমত, সবচেয়ে বড় কথা হলো, মুমিনকে নিজের গোনাহের চিন্তায় ও আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত থাকতে হবে। অন্যের কথা চিন্তা করা থেকে যথা সম্ভব বিরত থাকতে হবে। আমরা অধিকাংশ সময় অন্যের শিরক, কুফর, বিদ'আত, পাপ, অন্যায় ইত্যাদির চিন্তায় ব্যস্ত থাকি। মনে হয় আমাদের বেলায়াত, কামালাত, জান্নাত, নাজাত সবকিছু নিশ্চিত। এখন শুধু দুনিয়ার মানুষের সমালোচনা করাই আমার একমাত্র কাজ।

বাঁচতে হলে এগুলি পরিহার করতে হবে। প্রয়োজন ছাড়া পাপ বা পাপীর চিন্তায় নিজের হৃদয়কে ব্যস্ত রাখা খুবই অন্যায়। এই চিন্তা আমাদের কঠিন ও আখেরাত বিধ্বংসী পাপের মধ্যে ফেলে দেয়। তা হলো আত্মতৃপ্তি ও অহঙ্কার। যখনই আমি পাপীর চিন্তা করি তখনই আমার মনে তৃপ্তি চলে আসে, আমি তো তার চেয়ে ভাল আছি। তখন নিজের পাপ ছোট মনে হয় ও নিজের কর্মে তৃপ্তি লাগে। আর এ হলো ধ্বংসের অন্যতম পথ।

এজন্য সাধ্যমত সর্বদা নিজের সাংসারিক বা জাগতিক প্রয়োজন বা আল্লাহর যিক্‌র ও নিজের পাপের চিন্তায় নিজেকে রত রাখুন। হৃদয় পবিত্র থাকবে এবং আপনি লাভবান হবেন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক প্রদান করুন।

৪. জাগতিক জীবনের অস্থায়িত্ব স্মরণ

মানব জীবনে জাগতিক, সাংসারিক কর্মকাণ্ড, ব্যস্ততা ও চিন্তাভাবনা থাকবেই। আল্লাহ মানুষকে এসকল কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তবে এই ব্যস্ততা ও কর্ম নিজের, পরিবারের ও সমাজের সকলের পৃথিবীতে সুন্দররূপে বাঁচার ও পারলৌকিক জীবনে মুক্তি ও আল্লাহর সানিধ্যে অফুরন্ত নেয়ামত লাভের জন্য। কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামত ও বরকত অর্জন করে নিজে বাঁচতে হবে এবং অন্যকে বাঁচতে সাহায্য করতে হবে। কিন্তু শয়তানী প্ররোচনা ও মানবীয় দুর্বলতার কারণে আমরা সৃষ্টি ও কর্মের উদ্দেশ্যের একেবারে বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করি। আমরা স্বার্থপর হয়ে যাই এবং নিজের অপ্রয়োজনীয় ও অবৈধ স্বার্থরক্ষার জন্য অন্যান্যদের অকল্যাণ, ক্ষতি বা ধ্বংস কামনা করি বা সে জন্য চেষ্টা করি। এভাবে আমরা মূলত নিজেদেরকেও ধ্বংস করি। লোভ, লালসা, হিংসা, হানাহানি আমাদের হৃদয় ও জীবনকে বিষাক্ত ও কলুষিত করে, আমাদেরকে স্রষ্টার প্রেম, করুণা ও বরকত থেকে বঞ্চিত করে, তাঁর শাস্তির মধ্যে নিপতিত করে এবং সর্বোপরি আমাদের পারলৌকিক জীবনের কঠিন ধ্বংস ও ক্ষতি নিশ্চিত করে।

এই ক্ষতিকর পরিণতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য যুগে যুগে অনেক মানুষ সন্যাস, বৈরাগ্য বা সমাজ বিচ্ছিন্ন জীবন বেছে নিয়েছেন। এভাবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত করেছেন। ইসলামে বৈরাগ্য বা সমাজ বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ। সমাজের মধ্যে বসবাস করে, সকল কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করার সাথে সাথে নিজের হৃদয়কে মোহমুক্ত রাখায় ইসলামী বৈরাগ্য। আর এই অবস্থা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হলো প্রতিনিয়ত এই জাগতিক জীবনের অস্থায়িত্ব, মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের কথা নিজেকে স্মরণ করানো। কুরআন ও হাদীসে এজন্য বারবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পৃথিবীতে নিজেকে প্রবাসী বা পথিক হিসাবে গণ্য করতে বলা হয়েছে। এই স্মরণ আমাদের জন্য অগণিত সাওয়াব অর্জনের পাশাপাশি আমাদের হৃদয়গুলিকে লোভ, হিংসা, প্রতিহিংসা ইত্যাদির কঠিন ভার থেকে মুক্ত করবে। আমাদের জীবনকে হানাহানি ও হিংস্রতা থেকে মুক্ত করবে।

দিনের বিভিন্ন অবসরে ও বিশেষ করে সকালে, সন্ধ্যা বা রাতে নির্ধারিত সময়ে নিজেকে স্মরণ করান : যে মানুষের পরবর্তী নিশ্বাসের নিশ্চয়তা নেই সে কী জন্য হানাহানিতে লিপ্ত হবে? কিজন্য সে লোভ করবে। সেতো পথিক। চলার পথের প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পন্ন করা ও পাথেয় সংগ্রহই তো তার কাজ। চলার পথে যদি কেউ কষ্ট দেয় তাকে সম্ভব হলে ক্ষমা করে দিই না কেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই তো তাকে আর দেখব না। রাস্তায়, ফেরীতে, রেলস্টেশনে বা এয়ারপোর্টে বসার চেয়ার, ট্রলি, খাবারের প্লেট, সামান্য ধাক্কাধাক্কির জন্য কি আমরা সময় নষ্ট করে মারামারিতে লিপ্ত হই? এই জীবন তো এ সকল অস্থায়ী স্থানেরই একটু বিস্তৃত রূপ। চেষ্টা করি না কেন এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে ক্ষমা, ভালবাসা ও সেবায় ভরে দিতে। তাতে জীবন হবে আল্লাহর রহমতে ধন্য আর আমি অর্জন করব আখেরাতের অমূল্য পাথেয়।

পার্থিব স্বার্থপরতা বা লোভের জন্য প্রভুর নির্দেশনার বাইরে কাজ করছি? কি লাভ হবে তাতে? সে লাভ কি ভোগ করতে পারব? পারলে কতদিন। তারপর তো আমাকে প্রভুর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

অমুকের খুশির জন্য, তমুকের কাছে বড় হওয়ার জন্য, আরেকজনের কাছে প্রিয় হওয়ার জন্য আমি এই কাজটি করতে চাচ্ছি। কি লাভ তাতে? সে আমাকে কী দেবে? যা দেবে তা থেকে কি আমি লাভবান হতে পারব? আমাকে তো আমার প্রভুর কাছে একাকীই চলে যেতে হবে। আমার তো বাস্তববাদী হওয়া উচিত। নিজের জাগতিক ও পরকালীন জীবনের জন্য যে কাজে আমার রব খুশি সেই কাজই তো আমার করা উচিত।

পাঠক, এভাবে আমাদের উচিত প্রতিদিন নিজেদের সকল কর্ম বিচার করা। ক্ষণস্থায়ী প্রবাসের জন্য ও চিরস্থায়ী আবাসের জন্য যা প্রয়োজনীয় সেগুলিই করা। এ চিন্তা আমাদেরকে উপরে বর্ণিত ক্ষমাময় ও হিংসাহীন হৃদয় অর্জনেও সাহায্য করবে। এই চিন্তাগুলি বেলায়াত ও ইহসানের পথে আমাদের মহামূল্য পাথেয়।

যিক্‌র ওযীফা

আল্লাহর পথে চলার সহজ অথচ অপরিমেয় সাওয়াব ও অতুলনীয় প্রভাবের কর্ম হলো আল্লাহর যিক্‌র বা স্মরণ।

যিকিরের অর্থ, প্রকার, ফযীলত, প্রভাব, নিয়ম ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে "রাহে বেলায়েত" গ্রন্থে। এখানে শুধু সংক্ষেপে প্রাথমিক পর্যায়ে পালনীয় যিক্‌র ওযীফাগুলি আলোচনা করছি।

সাধারণভাবে ইসলামের পরিভাষায় যিক্‌র বলতে বুঝানো হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক শেখানো বিভিন্ন বাক্য সদা সর্বদা বা বিভিন্ন সময়ে অনবরত বা নির্দিষ্ট সংখ্যায় জপ করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর স্মরণ করা। যিকিরের মর্যাদায় অগণিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যিক্‌রকারীগণ সবার আগে জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাবেন। সদা সর্বদা আল্লাহর যিকিরে জিহ্বাকে আর্দ্র রাখা এবং আল্লাহর যিকিরে জিহ্বা নাড়তে নাড়তে মৃত্যুবরণ করা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কর্ম। কেয়ামতের দিন আল্লাহ যে সকল মহান মানুষদেরকে আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন তাঁদের অন্যতম হলেন ঐ সকল ব্যক্তি যারা নির্জনে আলাহর যিক্‌র করে চোখের পানিতে বুক ভাসান। যতক্ষণ বান্দা আল্লাহর যিক্‌র করবে ততক্ষণ আল্লাহ তার সঙ্গে থাকবেন। আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যিকিরের চেয়ে উত্তম আমল আর কিছুই নেই। জান্নাতের অধিবাসীগণ দুনিয়ার কোনো কিছুর জন্য আফসোস করবেন না, শুধুমাত্র যে মুহূর্তগুলি আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে সেগুলির জন্য তাঁরা আফসোস করবেন।" আল্লাহর যিক্‌র শয়তানের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়। যিকিরের এ ধরনের অগণিত ফযীলতের কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

যিকিরের প্রকারভেদ

আমাদের পালনের সুবিধার জন্য আমরা এখানে যিক্‌রকে দুইভাগে ভাগ করছি : প্রথমত: সদা সর্বদা পালনের যিক্‌র। দ্বিতীয়ত: নির্দিষ্ট সময়ে পালনের যিক্‌র।

প্রথম ওযীফা: সদা সর্বদা পালনের জন্য

প্রথম পর্যায়ের ওযীফা হিসাবে নিম্নের ১১ টি যিক্‌র, মুনাজাত, দুরুদ ও ইসতিগফার সবগুলি একত্রে বা যখন যেটা সম্ভব হয় সদা সর্বদা পালন করবেন। যখন, যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, ওযু ছাড়া, গোসল ছাড়া, বসে, শুয়ে, দাঁড়িয়ে, হাঁটতে চলতে, বাজারে, অফিসে, মাঠে, কর্মের মধ্যে, চায়ের দোকানে, মাজলিসে সর্বত্র যখনই আপনার মুখ বা মন একটু অবসর পাবে তখনই এই যিক্‌রগুলি কিছু কিছু করে জপ করতে থাকুন।

আমাদের মুখ ও বিশেষ করে মন কখনই চুপ থাকে না। কোনো না কোনো কিছু নিয়ে মন ব্যস্ত থাকে। সাধারণত ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা অবসর সময়ে, কখনো কখানো ঘণ্টার পর ঘণ্টা অলস চিন্তা করে থাকি। আর একটু সুযোগ পেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এ সকল বিষয় নিয়ে গল্প, আলোচনা বা বিতর্ক করে সময় নষ্ট করি। আমরা ভাবি না যে, আমাদের এই অলস (টহঢ়ৎড়ফঁপঃরাব) চিন্তা বা অর্থহীন আলোচনা, বিতর্ক আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক বা জাতীয় জীবনে কোনো উপকারেই লাগছে না। বরং এগুলি আমাদের প্রভূত ক্ষতি করে। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো অপ্রয়োজনী চিন্তা, ব্যথা, বিরক্তি, ক্রোধ, জিদ, হিংসা ইত্যাদি আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত ও কলুষিত করে। সাথে সাথে আমরা আলাহর যিক্‌র করে অগণিত সাওয়াব ও বরকত অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হই।

একটু চেষ্টা করলেই আমরা এই ক্ষতি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি। মুখ বা মনের অবসর হলেই তাকে আল্লাহর যিকিরে রত করি। অনেক সময় বেখেয়ালে মন বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে অলস চিন্তায় মেতে উঠে। যখনই খেয়াল হবে তখনই সেগুলিকে মন থেকে বের করে আল্লাহর যিকিরে মুখ ও মনকে বা শুধু মনকে নিয়োজিত করুন। যেমন, আপনি সকালে সংবাদ শুনেছেন বা পড়েছেন – অমুক স্থানে বোমাবর্ষণ হয়েছে বা অমুক ব্যক্তির মৃত্যু, শাস্তি, পদোন্নতি বা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার চিন্তা বা আলোচনা উক্ত বিষয়ে কোনো পরিবর্তন আনবে না। তবুও ভাবতে ভালো লাগে। আপনি অফিসে, দোকানে, গাড়িতে, বাড়িতে বা পথে-ঘাটে নিজের অজান্তে ঐ বিষয়টির বিভিন্ন দিক নিয়ে ভাবতে থাকবেন। এক ভাবনা থেকে অন্য ভাবনায় সাঁতার কাটতে থাকবেন। অর্থহীন সময় নষ্ট করবেন। একটু অভ্যাস করুন। বারবার মনকে আল্লাহর যিকিরের দিকে ফিরিয়ে আনুন। ইন্‌শা আল্লাহ, এক সময় আপনি আল্লাহর প্রিয় যাকিরে পরিণত হবেন।

আমাদের জীবনের অধিকাংশ উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা একেবারেই অর্থহীন, ভিত্তিহীন ও আমাদের ঈমান নষ্টকারী। আমাদের অধিকাংশ উৎকণ্ঠা "কি জানি কি হয়" বা ফলাফলের চিন্তা করে। মুমিনের ফলাফলের দায়িত্ব তো প্রভুর উপর ন্যস্ত। তাঁর আবার দুশ্চিন্তা কিসের? এগুলির পরিবর্তে আল্লাহর যিক্‌র করুন।

একটি উদাহারণ বিবেচনা করুন। এক ব্যক্তি ঢাকায় থাকেন। তার গ্রামের বাড়ি খুলনা। গ্রামের বাড়িতে তার কোনো নিকট আত্মীয়ের কঠিন অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তিনি ব্যস্ত হয়ে দেশে ফিরছেন। ঢাকা থেকে খুলনা পৌঁছাতে তার ৮/৯ ঘণ্টা সময় লাগবে। এই দীর্ঘ সময় তিনি স্বভাবতই অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটাবেন। সারা সময় তার মনে বিভিন্ন অমঙ্গল-চিন্তা ঘুরপাক খাবে। কথা বললেও তিনি এই বিষয়ে বিভিন্ন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে কথা বলবেন।

কিন্তু তার এই উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, অমঙ্গল চিন্তা কি তার বা তার অসুস্থ আপনজনের কোনো উপকারে লাগবে ? কখনোই না। তিনি মূলত পুরো সময়টি নেতিবাচক চিন্তা করে নষ্ট করছেন। তিনি নিজের মনকে নষ্ট করছেন। সর্বোপরি আল্লাহর যিকিরের অমূল্য সুযোগ তিনি নষ্ট করছেন। এই সময় যদি তিনি সকল দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে আল্লাহর যিকিরে কাটাতেন, অথবা দোয়ার মধ্যে সময় অতিবাহিত করতেন, তাহলে তিনি সকলদিক থেকে লাভবান হতেন।

আসলে আমরা অধিকাংশ সময় অলস বা অপ্রয়োজনীয় চিন্তা অথবা ভিত্তিহীন দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা বা অমঙ্গল-চিন্তা করে সময় নষ্ট করি। একটু অভ্যাস করলে আমরা এসকল মূল্যবান সময় আল্লাহর যিকিরে ব্যয় করে জাগতিক, মানসিক ও পারলৌকিকভাবে অশেষ লাভবান হতে পারি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক প্রদান করেন ; আমীন।

যিক্র নং ১ : لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

উচ্চারণ: 'লা- ইলা-হা ইলাল্লা-হ'

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

যিক্র নং ২ : سُبْحَانَ اللهِ

উচ্চারণ : 'সুব'হা-নাল্লা-হ', **অর্থ :** আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

যিক্র নং ৩ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

উচ্চারণ : সুব'হা-নাল্লা-হি ওয়া বি'হামদিহী।

অর্থ: "আলাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা (প্রশংসাময় পবিত্রতা) ঘোষণা করছি।"

যিক্র নং ৪ : سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْم

উচ্চারণ : সুবা'হা-নাল্লা-হিল আযীম।

অর্থ : "মহামহিম আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।"

যিক্র নং ৫ : اَلْحَمْدُ للهِ

উচ্চারণ : আল 'হামদু লিল্লা-হ। **অর্থ :** "সব প্রশংসা আলাহর জন্য।"

যিক্র নং ৬ : اَللهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণ : আল্লা-হু আকবার। **অর্থ :** "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।"

যিক্র নং ৭ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ

উচ্চারণ : লা- 'হাওলা ওয়া লা- ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থ : "কোনো অবলম্বন নেই, কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহ ছাড়া।"

যিক্র নং ৮: দরুদ শরীফ: (اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَسَلِّمْ)

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা সালি-'আলা- মুহাম্মাদিন, ওয়া আ-লিহী ওয়া সালিম।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনি সালাত প্রেরণ করুন মুহাম্মাদের (ﷺ) উপর ও তার পরিজন-অনুসারীগণের উপর, এবং সালাম প্রেরণ করুন। (অথবা দরুদে ইব্রাহীমী বা অন্য দরুদ)।

যিক্র নং ৯ (ইসতিগফার) :

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْر

উচ্চারণ : রাব্বিগ্ ফিরলী, ওয়া তুব 'আলাইয়্যা, ইন্নাকা আনতাত তাওয়া-বুল গাফূর।

অর্থ : "হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি মহান তাওবা কবুলকারী ও ক্ষমাকারী।"

যিক্র নং ১০: মুনাজাত

اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগ্ ফিরলী, ওয়ার'হামনী, ওয়াহদিনী, ওয়া 'আ-ফিনী, ওয়ারযুকনী।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমাকে সার্বিক নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন।"

যিক্র নং ১১: মুনাজাত

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ: "রাব্বানা- আ-তিনা- ফিদ্দুনইয়া- হাসানাতান, ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতান, ওয়াক্বিনা- 'আযা-বান না-রা"

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু, আপনি প্রদান করুন আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ-মঙ্গল, আখেরাতে কল্যাণ-মঙ্গল এবং রক্ষা করুন আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে।

যথাসম্ভব মনোযোগ দিয়ে ও অনুভব করে যিক্‌র করুন

উপরের যিক্‌রগুলি সব অথবা কয়েকটি বা একটি এক সময়ে পালন করতে পারেন। যে যিক্‌রটি যতক্ষণ ভাল লাগে জপ করুন। গণনার কোন দরকার নেই। আগে পরের হিসাব রাখতে হবে না। শুধু যথাসম্ভব অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে মনকে আল্লাহর দিকে রুজু করে যিক্‌রগুলি পাঠ করুন। অর্থের দিক থেকে মন সরে গেলে যখনই খেয়াল হবে আবার মনকে অর্থের দিকে নিয়ে আসবেন। না হলে অন্তত শব্দের দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

(লা- ইলা-হা ইল্লা–হ) জপ করার সময় নিজের মনের মধ্যে বারবার জাগরুক করুন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, ভয়ের কেউ নেই, ভক্তির কেউ নেই, চাওয়ার কেউ নেই, পাওয়ার কেউ নেই, ভাল করার কেউ নেই, মন্দ করার কেউ নেই, আমার হৃদয়ে আর কারো স্থান নেই।

সুব'হা-নাল্লাহ... অর্থের যিক্‌রগুলি জপের সময় অনুভব করুন যে, আপনি আপনার প্রভুর পবিত্রতার জয়ধ্বনি করছেন। পবিত্র তিনি, সকল শিরক থেকে, অপবাদ থেকে, তুলনা থেকে, পবিত্র তিনি, মহাপবিত্র তিনি।

আল'হামদু লিলা–হ জপ করার সময় নিজের মনকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে দিন। নিজের জীবনের অগণিত নেয়ামতের কথা স্মরণ করুন। আল্লাহ কিভাবে আপনাকে অগণিত রহমত ও নেয়ামতের মধ্যে রেখেছেন। স্মরণ করুন ও আলহামদু লিল্লাহ বলুন। জীবনের সকল কষ্ট, ব্যথা, অসুবিধা ও সমস্যার কথা ভুলে যান। অগণিত নেয়ামতের মধ্যে এগুলির স্থান কোথায়। কিছু সমস্যা তো থাকতেই হবে। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার মাধ্যমে এগুলিও আল্লাহ দূর করে দেবেন।

প্রতিটি মানুষের জীবনে আল্লাহর অসংখ্য সাধারণ ও বিশেষ নেয়ামত রয়েছে, যা তার জীবনকে ধন্য করেছে। এর পাশাপাশি প্রত্যেকের জীবনেই কিছু কষ্ট, বেদনা ও সমস্যা আছে। যেগুলি আল্লাহর অগণিত নেয়ামতের তুলনায় অতি নগণ্য। কিন্তু সাধারণত মানবীয় দুর্বলতার কারণে আমরা এসকল কষ্ট ও বেদনার অনুভূতি দ্বারা বেশি প্রভাবিত হই। শত নেয়ামতের বিপরীতে দুই চারিটি কষ্ট আমাদের পুরো মনকে ব্যথিত করে তোলে। ব্যর্থতা, কষ্ট, বেদনা, ক্রোধ ইত্যাদি অনুভূতি আমরা লালন করি। এসকল অনুভূতির স্থায়িত্ব আমাদের মনকে কলুষিত ও অপবিত্র করে, মানসিক শক্তি ও প্রেরণাকে ব্যহত করে, আমাদের কর্মস্পৃহা নষ্ট করে, আমাদের জীবনকে গ্লানিময় করে এবং সর্বোপরি আল্লাহর রহমত ও অফুরন্ত নেয়ামত লাভের পথ থেকে আমাদের দূরে নিয়ে যায়।

আল্লাহর বান্দা আল্লাহকে যেভাবে মনে করবে, সেভাবেই তাঁকে তার পাশে পাবে। জীবনের প্রতি না-বোধক অনুভূতি আল্লাহর রহমত থেকে বান্দাকে নিরাশ করে, যা কঠিনতম পাপ ও অবিশ্বাস। অপরদিকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আল্লাহ নেয়ামত বাড়িয়ে দেন। এজন্য মুমিনকে নিজের মনকে কৃতজ্ঞতা দিয়ে আবাদ করতে হবে। সকল কষ্ট, বেদনা, ব্যর্থতা ও উৎকণ্ঠা থেকে মনকে সাফ করে আল্লাহর অশেষ নেয়ামতের কথা স্মরণ করে এগুলির জন্য কৃতজ্ঞতার অনুভূতি দিয়ে হৃদয়কে ভরতে হবে। আর অবিরত সকৃতজ্ঞ চিত্তে বলতে হবে : 'আল-হামদু লিলাহ।' এই যিক্‌র যাকিরের মনকে ভারমুক্ত করবে, গ্লানিমুক্ত করবে, শক্তিশালী করবে এবং আল্লাহর রহমত, নেয়ামত ও বরকত তাঁর জীবন ভরে তুলবে।

'আল্লাহু আকবার', যিকিরের সময় হৃদয়কে আল্লাহর পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতিতে ভরে তুলুন। তিনিই বড়, তিনিই শ্রেষ্ঠ। আর সবই মূল্যহীন। অন্য কারো বড়ত্ব, শক্তি, মহত্ত আমার হৃদয়কে প্রভাবিত করে না। একমাত্র তাঁরই শ্রেষ্ঠত্বের জয়গান গাই আমি। সকল ভয় ও হীনমন্যতার অনুভূতি থেকে মুক্ত আমার হৃদয়।

(লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা...) যিক্‌র করার সময় নিজের ও বিশ্বের সকল সৃষ্টির অসহায়ত্ব, ক্ষমতাহীনতা অনুভব করুন। একমাত্র আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা ও নির্ভরতার অনুভূতি নিজের মনে জাগরুক করুন।

দরুদ শরীফ পাঠের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মর্যাদা ও অধিকারের কথা অনুভব করুন। তিনি আমাদের জন্য যা করেছেন আমরা জীবন বিলিয়ে দিলেও তাঁর সামান্যতম প্রতিদানও দিতে পারব না, কারণ আমরা হয়ত আমাদের পার্থিব সংক্ষিপ্ত জীবনটা বিলিয়ে দিলাম, কিন্তু তিনি তো আমাদের পার্থিব ও পরলৌকিক অনন্ত জীবনের সফলতার পথ দেখাতে তাঁর মহান জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। আমরা তো তাঁর জন্য কিছুই করতে পারব না। শুধুমাত্র অন্তর দিয়ে আল্লাহর কাছে বলি, আল্লাহ আপনি আপনার হাবীবের উপর সালাত সালাম পাঠান, তাঁর পরিজন ও অনুসারীদের উপর। এভাবে দরুদ পাঠের সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মহব্বত হৃদয়ে জাগরুক করতে থাকুন।

ইসতিগফারের সময় নিজের পাপের কথা স্মরণ করুন। মহান আল্লাহর অগণিত নেয়ামতের পরিবর্তে কিভাবে আমরা তাঁর অবাধ্যতা করি তা স্মরণ করুন। আল্লাহ ক্ষমা না করলে কোন উপায় নেই ধ্বংস অনির্বার্য তা অনুভব করুন এবং ইসতিগফার পাঠ করুন।

মুনাজাত হৃদয় দিয়ে অনুভব করে আবেগ ও আকুতি দিয়ে জপ করুন। আল্লাহ আপনি না দিলে তো কেউই কিছু দিতে পারবে না। আল্লাহ আপনি দয়া করে আমার কর্মের দিকে না তাকিয়ে আমাদের আবেগ ও আশার দিকে তাকিয়ে আমাকে ক্ষমা করুন, আপনার দয়া দিয়ে আমার জীবন ভরে দিন, যেন আর কারো দয়ার আর আমার দরকার না হয়।, আমাকে আপনার সন্তুষ্টির পথে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আলাহ, আপনি আমাকে সার্বিক নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করুন, সকল বিপদ আপদ, সমস্যা, কষ্ট যুলুম, অত্যাচার, অশান্তি থেকে রক্ষা করুন। দয়াময় আমাকে রিযিক দান করুন, আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্ত রাখুন। এভাবে বারবার দোয়াটি পাঠ করতে থাকুন।

দ্বিতীয় মুনাজাতেও একইভাবে হৃদয় দিয়ে আল্লাহর কাছে পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জীবনর সকল কল্যাণ, মঙ্গল, উন্নতি, সফলতা প্রার্থনা করুন।

এ সকল যিকিরের ফযীলত

বিভিন্ন হাদীসে এসকল বাক্যে বেশি বেশি যিকিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তার অপরিমেয় ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বারবার (লা ইলাহা ইল্লাল্লুহ) বলে ঈমানকে নবায়িত করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন এই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র। তিনি বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্য চারটি : 'সুব'হা-নালাহ', 'আল-হামদুলিলাহ', 'লা-ইলাহা ইলাল্লাহ' এবং 'আলাহু আকবার'। তুমি ইচ্ছামতো এই বাক্য চারিটির যে কোনো বাক্য আগে পিছে বলতে পার। তিনি বলেন, 'সুব'হা-নালাহ', 'আল-হামদুলিলাহ', 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' বলতে আমি এত বেশি পছন্দ করি যে, এগুলি বলা আমার কাছে পৃথিবীর বুকে সূর্যের নিচে যা কিছু আছে সবকিছু থেকে বেশি প্রিয়। এই বাক্যগুলি প্রতিটি বাক্য একবার বললে জান্নাতে একটি করে বৃক্ষ রোপণ করা হয়। এই বাক্যগুলির প্রত্যেক বাক্য একবার যিক্‌র করা একবার আল্লাহর ওয়াস্তে দান করার সমতুল্য। এই বাক্যগুলি কেয়ামতের দিনে বান্দার আমল নামায় সবচেয়ে বেশি ভারী হবে। এগুলি জাহান্নামের আগুন থেকে মুমিনের ঢাল। গাছের ডালে ঝাকি দিলে যেমন পাতাগুলি ঝরে যায় অনুরূপভাবে এই যিক্‌রগুলি বললে বান্দার গোনাহ ঝরে যায়। এই চারিটি বাক্য যিক্‌রকারী প্রতিটি বাক্যের প্রতিটি অক্ষরের জন্য ১০টি করে সাওয়াব লাভ করবেন। আল্লাহ এই চারটি বাক্যকে বেছে পছন্দ করে নিয়েছেন। এই বাক্যগুলির যে কোনো একটি বাক্য একবার বললে আল্লাহ ২০ টি সাওয়াব প্রদান করবেন এবং ২০ টি গোনাহ ক্ষমা করবেন। আর এভাবে যে বেশি বেশি যিক্‌র করবে সে মুনাফিকী থেকে মুক্তি লাভ করবে। এসকল যিকিরের কারণে বান্দা রিযিক প্রাপ্ত হয়।

তিনি বলেছেন, দুইটি বাক্য জিহ্বায় উচ্চারণের জন্য খুবই হালকা, আর কেয়ামতের দিন কর্ম পরিমাপের পাল্লায় খুবই ভারী এবং আলাহর নিকট প্রিয় : সুব'হা-নালাহি ওয়া বি'হামদিহী, সুবহানাল্লাহিল 'আযীম।" আরো বলেছেন, যদি কেউ ১০০ বার 'সুব'হা-নাল্লহি ওয়া বি'হামদিহী' বলে, তাহলে আল্লাহ তাঁর জন্য ১,২৪,০০০ (একলক্ষ চব্বিশ হাজার) সাওয়াব লিখবেন। যে ব্যক্তি ১০০ বার এই যিক্‌র বলবে, তাঁর সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমতুল্য হয়।"

১০০ বার 'সুব'হা-নাল্লাহ' বললে ১০০ টি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সাওয়াব দান করবেন মহান আল্লাহ। ১০০ বার 'আল হামদু লিল্লাহ' বললে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য ১০০ টি সাজানো ঘোড়ায় মুজাহিদ প্রেরণের সমপরিমাণ সাওয়াব, ১০০ বার 'আল্লাহু আকবার' বললে ১০০ টি মাকবুল উট কুরবানির সমপরিমাণ সাওয়াব, ১০০ বার 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বললে আসমান ও জমিন পূর্ণ সাওয়াব প্রদান করবেন মহান আল্লাহ। আরে বেশি যিক্‌র করলে এভাবে আরো বেশি সাওয়াব, মর্যাদা রহমত অর্জিত হবে।

রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবে, কারণ এ হলো জান্নাতের ভাণ্ডারগুলির মধ্যে একটি ভাণ্ডার ও জান্নাতের একটি দরজা। এই যিক্‌র একবার পাঠ করা হলো জান্নাতে বৃক্ষ রোপণ করা। "পৃথিবীতে যে কোনো ব্যক্তি যদি বলে : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আল্লাহু আকবার, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আল্লাহ মহান, কোনো অবলম্বন নেই এবং কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া), তাহলে তার সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়।"

এরূপ অগণিত হাদীসে এ সকল যিক্‌রের অভাবনীয় ফযীলত ও সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে এত বেশি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, শুধুমাত্র এ বিষয়ক সহীহ হাদীস সংকলিত করলেই একটি বড় বই হয়ে যাবে।

দরুদ শরীফ মুমিনের অন্যতম যিক্‌র ও হৃদয়ের সবচেয়ে বড় প্রশান্তি। রাসূলুলাহ ﷺ অসংখ্য হাদীসে তাঁর উপর দরুদ ও সালামের নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং সালাত ও সালামের অতুলনীয় পুরস্কারের বর্ণনা দিয়েছেন। হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কোন উম্মত তাঁর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করলে আল্লাহ তাকে অগণিত পুরস্কার প্রদান করেন, তার গোনাহ ক্ষমা করেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, তার উপর রহমত বর্ষণ করেন, ফিরিশতাগণ তাঁর জন্য দোওয়া করেন, তার সালাত ও সালাম তার নাম ও পিতার নামসহ ফিরিশতাগণ রাসূলুলাহ ﷺ এর রাওযা মুবারাকায় পৌঁছে দেন, তিনি তাঁর জন্য দোওয়া করেন। সর্বোপরি যে ব্যক্তি যত বেশী সালাত ও সালাম পাঠ করবে সে কেয়ামতে ততবেশী তাঁর নৈকট্য পাবে। অধিক পরিমাণে সালাত পাঠকারীর সকল সমস্যা আল্লাহ মিটিয়ে দিবেন।

ইসতিগফার বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা বান্দার অন্যতম যিক্‌র ও অফুরন্ত নেয়ামতের উৎস। ইসতিগফারের মাধ্যমে বান্দা যিকিরের সকল ফযীলত ও বরকত লাভ করেন। সাথে সাথে আল্লাহর ক্ষমা লাভে ধন্য হন।

পাপ মানুষের হৃদয়কে কলুষিত করে। তাকে তার মহান স্রষ্টার করুণার পথ থেকে দূরে নিয়ে যায়। মহান রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত ভালবেসে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে ভালবেসেছেন এবং সম্মানিত করেছেন। পাপ যেন মানুষকে কলুষিত করতে না পারে সে জন্য তিনি ক্ষমার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাওবা ও ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার ফলে বান্দা শুধু পাপমুক্তই হয় না, উপরন্তু সে অশেষ সাওয়াব ও মহান মর্যাদার অধিকারী হয়। যে কোনো মানুষ যখন পাপের জন্য আল্লাহর কাছে সর্বান্তকরণে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন সে আল্লাহর ক্ষমা লাভে সক্ষম হয়। উপরন্তু এই ক্ষমা প্রার্থনা, অনুতাপ ও ক্রন্দনের কারণে তার হৃদয় আরো পবিত্র ও মুক্ত হয়। সে আল্লাহর আরো বেশি নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জন করে।

মহান আল্লাহ বান্দাকে যে কোনো পাপের পরেই ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং ক্ষমা প্রার্থনাকারীগণের জন্য নিশ্চিত ক্ষমা, অফুরন্ত সাওয়াব ও জান্নাতের অনন্ত নেয়ামতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিদিন শতাধিকবার ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তিনি উম্মতকে সদা সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা বা ইস্তিগফারের নির্দেশ দিয়েছেন।

কুরআনের বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি ক্ষমা তো করেনই, উপরন্তু জাগতিক রিযক, সম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে বরকত অফুরন্ত বরকত ও বৃদ্ধি দান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "হে মানুষেরা তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর। নিশ্চয় আমি একদিনের মধ্যে ১০০ বার আল্লাহর নিকট তাওবা করি বা ইস্তিগফার করি।" তিনি একই বৈঠকে ১০০ বার ইসতিগফার করতেন।

তিনি বলেন, আল্লাহ বলেন: হে আদম সন্তান, তুমি যতক্ষণ আমাকে ডাকবে ও আমার করুণার আশা করবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব, তুমি যাই কর না কেন, কোনো কিছুই পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান, যদি তোমার পাপ আসমান স্পর্শ করে এরপরও তুমি ইস্তিগফার কর বা ক্ষমা চাও আমি তোমাকে ক্ষমা করব, কোনো পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান, তুমি যদি পৃথিবী পূর্ণ পাপ নিয়ে আমার কাছে হাজির হও, কিন্তু শির্ক থেকে মুক্ত থাক, তাহলে আমি পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা তোমাকে প্রদান করব।" তিনি আরো বলেন, সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যার আমলনামায় অনেক ইস্তিগফার পাওয়া গিয়েছে।"

আল্লাহর কাছে দোয়া করা অন্যতম যিক্‌র ও শ্রেষ্ঠতম ইবাদত। জুতার ফিতা, লবন, ইত্যাদি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জাগতিক বিষয় সহ জাগতিক ও পারলৌকিক সবকিছুই আল্লাহর কাছে চাইতে হবে এবং চাওয়া ইবাদত। আল্লাহর কাছে দোয়া মুনাজাতের চেয়ে সম্মানিত ও প্রিয় বিষয় আর কিছুই নেই। তিনি তাঁর কাছে চাইলে আনন্দিত হন এবং না চাইলে অসন্তুষ্ট হন। বান্দার দোয়া আল্লাহ কবুল করবেনই। তাকে প্রার্থিত বিষয় দান করবেন, অথবা তার বদলে আরো ভালো কোন বিষয় দান করবেন, অথবা এর বিনিময়ে কোন অমঙ্গল দূর করবেন, অথবা বিনিময়ে আখেরাতে অভাবনীয় নেয়ামত প্রদান করবেন। কাজেই আমাদের সর্বদা চাইতে হবে। উপরের ওযীফার ১০ ও ১১ নং যিকিরে উল্লেখিত মুনাজাত দুইটি সর্বদা বেশিবেশি পাঠ করতে শিক্ষা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ।

দ্বিতীয় ওযীফা : সকালে, দিবসে ও সন্ধ্যায় পালনের ওযীফা

ক) ফজরের সালাতের পরে

ফজরের সালাত জামাতে আদায়ের পরে যিকিরে রত থাকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতে আদায় করবে, এরপর বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে রত থাকবে। অতঃপর সে দুই রাক'আত নামায আদায় করবে, সে একটি হজ্ব ও একটি ওমরার সাওয়াব পাবে, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ (হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব)।" এই অর্থে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ফজরের পরে যিকিরের দুইটি পর্যায় রয়েছে। **প্রথম পর্যায়** – নামাযের পরে বসে, বিশেষত চারজানু হয়ে বসে সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত যিক্‌র করা, যখন মাকরুহ ওয়াক্ত শেষ হবে। **দ্বিতীয় পর্যায় হলো** – মাকরুহ ওয়াক্ত শেষ হলে (সূর্যোদয়ের মোটামুটি আধাঘণ্টা পরে) অন্তত দুই রাক'আত দোহার বা চাশতের নামায আদায় করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে ফজরের পরে চারজানু হয়ে সূর্য পুরোপুরি উঠা পর্যন্ত বসে থাকতেন। তিনি নিশ্চুপ বসে থাকতেন অথবা চুপে চুপে যিক্‌র করতেন। সাহাবীগণ অনেকে তার চারিপার্শে বসতেন। তারা কখনো প্রত্যেকে নিজে নিজে চুপে চুপে যিক্‌র করতেন। কখনো তিনি ফজরের পরে সাহাবীগণের সাথে কথাবার্তা বলতেন বা রাত্রে কে কী স্বপ্ন দেখেছে তা আলোচনা করতেন। অনেক সময় সাহাবীগণ বিভিন্ন গল্প, জাহেলী যুগের বিভন্ন ঘটনা আলোচনা করতেন। তারা অনেক সময় হাসতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু মুচকি হাসতেন। সাধারণত সূর্য ওঠার পরে তিনি উঠে তাঁর ঘরে আসতেন।

এ সময়ে নিম্নের যিক্‌রগুলি পালন করবেন

নিম্নের যিক্‌রগুলি সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো ও আচরিত যিকিরের অন্যতম। বিস্তারিত আলোচনা পরিত্যাগ করেছি। শুধুমাত্র বিশেষ কোন ফযীলতের বর্ণনা থাকলে তা উল্লেখ করেছি। সবগুলি আদায় করতে না পারলে সাধ্যমত বেছে নিয়ে পালন করবেন।

১) তিন বার: أَسْتَغْفِرُ اللهَ (আসতা'গফিরুল্লা-হ) "আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

২) এক বার:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَام

উচ্চারণ : আলা-হুম্মা আনতাস সালা-মু ওয়া মিনকাস সালা-মু, তাবা-রাকতা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আপনিই সালাম (শান্তি), আপনার থেকেই শান্তি, হে মহাসম্মানের অধিকারী ও মর্যাদা প্রদানের অধিকারী, আপনি বরকতময়।"

৩) একবার নিম্নের দোয়াটি:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা 'ইলমান না-ফি'আন, ওয়া রিযক্বান ত্বাইয়িবান, ওয়া 'আমালান মুতাক্বাব্বালান। অর্থ : "হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাচ্ছি কল্যাণকর জ্ঞান, পবিত্র (বরকতময় ও হালাল) রিযিক ও কবুলকৃত কর্ম।"

৪) সালামের পরে কোন কথা বলার আগে সাতবারঃ

اَللَّهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণ : আলা-হুম্মা, আজিরনী মিনান না-র।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।"

ফজর ও মাগরিবের সালাতের পরে কোন কথা বলার পূর্বে এই দোয়াটি ৭ বার বলে ঐ দিন বা রাতে মৃত্যু হলে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

৫) দশ বার, সম্ভব হলে ১০০ বারঃ

لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইলাল্লা-হু, ওয়া'হদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল 'হামদ, ইউ'হয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুআ 'আলা- কুলি-শাইয়িন কাদীর।

অর্থ : "আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন। এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর এবং ফজরের নামাযের পর, ঘুরে বসা বা নড়াচড়ার আগেই, পা গুটানো অবস্থাতেই, কোনো কথা বলার আগে উপরের এই যিক্‌রটি **১০ বার পাঠ করবে** আল্লাহ তার প্রত্যেক বারের জন্য ১০ টি সাওয়াব লিখবেন, ১০ টি গোনাহ ক্ষমা করবেন, তাঁর ১০ টি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, ঐদিনের জন্য তাকে সকল অমঙ্গল ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করা হবে, শয়তান থেকে পাহারা দেওয়া হবে। অন্য হাদীসে ১০০ বার পাঠের বিশেষ ফযীলত বলা হয়েছে।

৬) একবারঃ আয়াতুল কুরসী :

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তাঁর জান্নাতে প্রবেশের পথে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো বাধা থাকবে না।" এবং "যে ব্যক্তি ফরয নামাযের শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে সে পরবর্তী নামায পর্যন্ত আলাহর জিম্মায় থাকবে।"

৭) তিনবার করেঃ সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস

৮) তিনবার নিম্নের যিক্‌রটি :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

উচ্চারণ : সুব'হা-নাল্লা-হি ওয়াবি'হামদিহী, 'আদাদা খাল্‌ক্বিহী, ওয়ারিদ্বা- নাফ্‌সিহী, ওয়া যিনাতা 'আরশিহী ওয়া মিদা-দা কালিমাতিহী। **অর্থ :** "পবিত্রতা আলাহর এবং প্রশংসা তাঁরই, তাঁর সৃষ্টির সম সংখ্যক, তার নিজের সন্তুষ্টি পরিমাণে, তাঁর আরশের ওজন পরিমাণে এবং তাঁর বাক্যের কালির সমপরিমাণ।"

এই চারিটি বাক্য তিনবার করে বললে সারা সকাল যিক্‌র করার সাওয়াব আল্লাহ প্রদান করবেন বলে হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে।

৯) তিনবার নিম্নের যিক্‌রটি

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হিল লাযী লা- ইয়াদুরুরু মা'আ ইসমিহী শাইউন ফিল আরদি ওয়া লা- ফিস সামা-ই, ওয়া হুআস সামীউল 'আলীম। **অর্থঃ** "আল্লাহর নামে (শুরু করছি), যাঁর নামের সাথে জমিনে বা আসমানে কোনো কিছুই কোনো ক্ষতি করতে পারে না।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কেউ সকালে ও সন্ধ্যায় তিন বার করে এ দোয়াটি পাঠ করে তাহলে ঐ দিনে ও ঐ রাতে কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।

১০) সাতবার নিম্নের যিক্‌রটি

حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

উচ্চারণ : হাসবিয়াল্লা-হু, লা- ইলাহা ইলা- হুআ, 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু, ওয়া হুআ রাব্বুল 'আরশিল আযীম। **অর্থ :** "আলাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি, তিনি মহান আরশের প্রভু।"

সকালে ও সন্ধ্যায় ৭ বার এই আয়াতটি পাঠ করলে আল্লাহ সকল চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও সমস্যা মিটিয়ে দেবেন বলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে।

১১) দশবার দরুদ শরীফ : দরুদে ইবরাহীমী বা যে কোন দরুদ।

রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সকালে দশ বার ও সন্ধ্যায় দশ বার আমার উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করবে, সে কেয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভ করবে।

১২) একশতবার করে নিম্নের চারিটি যিক্‌র মোট ৪০০ বার

'সুবহানালাহ', 'আল-হামদুলিলাহ', 'লা-ইলাহা ইলালাহু', 'আলাহু আকবার'

রাসূলুলাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে সে যেন একশতটি হজ্ব আদায় করল বা একশতটি উট আল্লাহর ওয়াস্তে দান করল। যে ব্যক্তি এই দুই সময়ে ১০০ বার 'আল-হামদু লিলাহ' বলল সে যেন আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ১০০ টি ঘোড়ার পিঠে মুজাহিদ প্রেরণ করলো, অথবা আল্লাহর রাস্তায় ১০০ টি গাযওয়া বা অভিযানে শরীক হলো। আর যে ব্যক্তি এই দুই সময়ে ১০০ বার করে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করলো, সে যেন ইসমাঈল বংশের একশত ব্যক্তিকে দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদান করলো। আর যে ব্যক্তি এই দুই সময়ে ১০০ বার করে 'আল্লাহু আকবার' বলল, ঐ দিনে তার চেয়ে বেশি আমল আর কেউ করতে পারবে না। তবে যদি কেউ তার সমান এই যিক্‌রগুলি পাঠ করে বা তার চেয়ে বেশি পাঠ করে তাহলে ভিন্ন কথা। (তাহলে সেই শুধু তার উপরে উঠতে পারবে।)

১৩) একশতবার 'সুবহানালাহি ওয়া বিহামদিহী'

এই তাসবীহটি সকালে ও সন্ধ্যায় ১০০ বার পাঠ করলে অপরিমেয় সাওয়াব ও সকল (সাধারণ সগীর) গোনাহের ক্ষমা লাভ করা যাবে বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪) একবার নিম্নের যিক্‌রটি

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ : আলা-হুম্মা, আ'ইননী 'আলা- যিক্‌রিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবা-দাতিকা। **অর্থ :** "হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আপনার যিক্‌র করতে, শুকর করতে এবং আপনার ইবাদত সুন্দরভাবে করতে তাওফীক ও ক্ষমতা প্রদান করুন।"

১৫) একবার নিম্নের যিক্‌র

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

উচ্চারণ: ইয়া- হাইউ ইয়া কাইউমু, বিরাহমাতিকা আসতাগীসু, আসলিহ লী শা'নী কুলাহু, ওয়া লা- তাকিলনী ইলা- নাফসী তারফাতা 'আইন।

অর্থ: "হে চিরঞ্জীব, হে মহারক্ষক ও অমুখাপেক্ষী তত্ত্বাবধায়ক, আপনার রহমতের ওসীলা দিয়ে ত্রাণ প্রর্থনা করছি। আপনি আমার সকল বিষয়কে সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করুন। আর আমাকে একটি মুহূর্তের জন্যও, চোখের পলকের জন্যও আমার নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দিবেন না (সর্বদা আপনার তত্ত্বাবধানে আমাকে রাখুন)।"

রাসূলুলাহ ﷺ ফাতেমা (রা)-কে সকাল সন্ধ্যায় দোয়াটি পড়তে নির্দেশ দেন।

১৬) একবার সাইয়িদুল ইসতিগফার

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ

উচ্চারণ : আলা-হুম্মা, আনতা রাব্বী, লা- ইলা-হা ইলা- আনতা, খালাক্বতানী, ওয়াআনা 'আবদুকা, ওয়াআনা 'আলা- 'আহদিকা ওয়াওয়া'অদিকা মাস তাতা'অতু। আ'উযু বিকা মিন শাররি মা- স্বানা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা, ওয়াআবূউ লাকা বিযামবি। ফাগ্‌ফিরলী, ফাইন্নাহু লা- ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা- আনতা।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রভু, আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আমি আপনার কাছে প্রদত্ত অঙ্গিকার ও প্রতিজ্ঞার উপরে রয়েছি যতটুকু পেরেছি। আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমি যে কর্ম করেছি তার অকল্যাণ থেকে। আমি আপনার কাছে প্রত্যাবর্তন করছি আপনি আমাকে যত নেয়ামত দান করেছেন তা-সহ এবং আমি আপনার কাছে প্রত্যাবর্তন করছি আমার পাপ-সহ। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, কারণ আপনি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না।"

রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন : "এই দোয়াটি সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দোওয়া। যে ব্যক্তি এই দোয়ার অর্থের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রেখে দিনের বেলায় তা পাঠ করবে সে যদি ঐ দিন সন্ধ্যার আগে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জান্নাতী হবে। আর যদি কেউ এই দোয়ার অর্থে সুদৃঢ় একীন ও বিশ্বাস রেখে রাত্রে তা পাঠ করবে, সে যদি ঐ রাতেই সকালের আগে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জান্নাতী হবে।"

১৭) সর্বদা পালনীয় যিক্‌র বা প্রথম ওযীফা

উপরের যিক্‌রগুলি পালন করার পরে সময় সুযোগ ও আবেগ অনুসারে যতক্ষণ সম্ভব হয় উপরের প্রথম ওযীফায় বর্ণিত ১১ প্রকার যিক্‌র সবগুলি বা কিছু উপরের নিয়মে পালন করবেন। হাদীস শরীফে এই সময়ে উপরের ১১ প্রকার যিকিরের মধ্যে ১, ২, ৫ ও ৬

নং যিক্‌র ('সুবহানাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' ও 'আল্লাহু আকবার') বেশিবেশি জপ করার জন্য বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয়েছে ও বিশেষ ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। অন্তরকে যতটুকু সম্ভব সকল পার্থিব আকর্ষণ, জাগতিক চিন্তা ও ব্যস্ততা থেকে এই সময়টুকুর জন্য মুক্ত করে, আল্লাহর দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে যিক্‌র করবেন। কখনো মনোযোগ পূর্ণ না হলে চিন্তিত না হয়ে যিকিরে রত থাকতে হবে। মনোযোগ ও আবেগের কম-বেশি হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে সর্বদা চেষ্টা করতে হবে পূর্ণতার জন্য।

যারা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন বা কুরআনের কিছু আয়াত বা সূরা মুখস্থ আছে তাঁরা এ সময়ে কিছু সময় তিলাওয়াত করতে পারেন।

যিক্‌র শেষে অন্তরের আকুতি দিয়ে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করবেন। আল্লাহর কাছে নিজের গোনাহ, ইবাদত পালনে দুর্বলতা, অক্ষমতা ও ত্রুটির কথা উল্লেখ করে ক্ষমা ভিক্ষা করবেন। নিজের সকল মৃত মুরব্বী, পিতামাতা, সাহাবী, তাবেয়ীন ও সকল যুগের আলিম, ফকীহ, ওলী, বুজুর্গ মাশাইখ ইত্যাদি যাদের মাধ্যমে আমরা ইসলাম পেয়েছি তাঁদের জন্য প্রাণখুলে মহব্বতের সাথে দোয়া করবেন। নিজের জন্য ও জীবিত পিতামাতা, উস্তাদ, শাইখ, আল্লাহর ওয়াস্তের ভাই ও সকল মুসলমানের জন্য কল্যাণ চেয়ে দোয়া করবেন। সবসময় একরকম আবেগ থাকবে না। হৃদয়ের অবস্থা ও আবেগ অনুসারে যতক্ষণ সম্ভব দোয়া করবেন। দোয়া কিন্তু শুধু চাওয়া নয়। দোয়া হল শ্রেষ্ঠ যিক্‌র ও ইবাদত। দোয়ার মধ্যে আবেগ আসুক বা না আসুক যতক্ষণ আমরা দোয়ায় রত থাকি ততক্ষণ আমরা ইবাদত ও যিকিরে রত থাকি। আল্লাহর দয়া হলে দোয়ার জন্যও আমরা যিকিরের যত সাওয়াব ও ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে সবই লাভ করতে পারব।

সম্ভব হলে এভাবে চাশত বা দোহার সালাত আদায় পর্যন্ত যিক্‌র ও মুনাজাতে রত থাকবেন। না হলে মুনাজাত শেষে নিজের কাজে যাবেন। পরে সুযোগ মত দোহার সালাত আদায় করবেন।

খ) সারাদিনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে করণীয়

সারাদিনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে প্রথম ওযীফায় উল্লেখিত যিক্‌রগুলি যথাসাধ্য পালন করুন। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার মাধ্যমে বিভিন্ন নেতিবাচক অনুভূতি, রাগ, বিরাগ, বিরক্তি, কষ্ট, ব্যাথ্যা, হতাশা, হিংসা ইত্যাদি প্রবল শক্তি দিয়ে আমাদের মস্তিষ্ককে আক্রমণ করে ও ক্ষতবিক্ষত করে দেয়, কলুষিত ও ভারাক্রান্ত করে। মনের ও মুখের অবসর হলেই এরা হামলা চালায় ও বিরক্তি, কষ্ট ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে। এ সকল অলস (টহঢ়ৎড়ফঁপঃরাব) ও ক্ষতিকর চিন্তা কল্পনা থেকে আত্মরক্ষার সর্বোত্তম উপায় হলো উপরে বর্ণিত ভাবে আল্লাহর যিকিরের মুখ ও মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রাখুন। আপনার মুখ নাড়া দেখে কে কি বলবে তা কোন সময় চিন্তা করবেন না। পৃথিবীতে কারো কিছু করার বা দেয়ার ক্ষমতা নেই। আপনার প্রভুর সাথে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন।

গ) মাগরীবের সালাতের পরে

মাগরীবের সালাতের পরে ফজরের পরে পালনীয় ১৬ প্রকার যিক্‌রগুলি পালন করুন। শুধুমাত্র ৩ নং যিক্‌র (আলা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা 'ইলমান না-ফি'আন)- এর পরিবর্তে নিম্নের যিক্‌রটি তিনবার বলুন:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

উচ্চারণ: আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মা-তি, মিন শার্‌রি মা- খালাক্বা।

অর্থ : "আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করছি, তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অকল্যাণ থেকে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কেউ সন্ধ্যার সময় এই দোয়াটি তিন বার পাঠ করে তাহলে সেই রাতে কোনো বিষ বা দংশন তাকে ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি আরো বলেন, যদি কেউ কোনো স্থানে গমন করে বা সফরে কোথাও থামে এবং উপরের দোয়াটি বলে, তাহলে ঐ স্থান পরিত্যাগের আগে (ঐ স্থানে অবস্থান রত অবস্থায়) কোনো কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।

তৃতীয় ওযীফা : যোহর, আসর ও ইশার পরে পালনীয়

যোহরের সালাতের পরে উপরের দ্বিতীয় ওযীফা বা সকালের ওযীফায় উল্লেখিত যিক্‌রগুলির মধ্য থেকে নিম্নের যিক্‌রগুলি পালন করুন।

১) তিন বার: أَسْتَغْفِرُ اللهَ (আসতা'গফিরুল্লা-হ)

২) এক বার: আলা-হুম্মা আনতাস সালা-মু ওয়া মিনকাস সালা-মু, তাবা-রাকতা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম।

৩) একবার: আয়াতুল কুরসী:

৪) একবার করে: সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস

৫) একশতবার করে চারিটি যিক্‌র মোট ৪০০ বার: 'সুবহানাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' ও 'আল্লাহু আকবার'। সময় না থাকলে যোহর ও ইশার সালাতের পরে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবেন। আসরের সালাতের পরে ১০০ বার করে ৪টি যিক্‌র মোট ৪০০ বার পালন করবেন।

৬) একবার "আলা-হুম্মা, আ'ইননী 'আলা- যিক্‌রিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবা-দাতিকা।"

আসরের সালাতের পরে চেষ্টা করবেন উপরের যিক্‌র পালনের পরে কিছুক্ষণ প্রথম ওযীফার সর্বদা পালনীয় যিক্‌রগুলি, বা অন্তত ১, ২, ৫ ও ৬ নং যিক্‌র ('সুবহানাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' ও 'আল্লাহু আকবার') কিছু সময় আদায় করতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতুল আসরের পর থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত এই যিক্‌রগুলি পালন করতে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন ও বিশেষ ফযীলতের কথা জানিয়েছেন। আমাদের উচিৎ সাধ্যমত তা পালন করার।

বিশেষ করে শুক্রবার আসরের পর থেকে সুর্যাস্ত **পর্যন্ত** সময়ের মধ্যে দোয়া কবুল হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগে এসময়ে যিক্‌র ও দোয়া করার বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হতো।

ইশার সালাতের পরে উপরের ওযীফাগুলি আদায়ের পরে দুইটি অতিরিক্ত ওযীফা পালনের চেষ্টা করবেনঃ কুরআন ও দরুদ শরীফ। হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, কুরআন ও দরুদ পাঠের বিশেষ ওযীফা শেষ রাত্রে পালন করা উত্তম। যিনি শেষ রাতে উঠতে পারেন না বা উঠে বেশি সময় ওযীফার জন্য ব্যয় করতে না পারেন, তিনি প্রথম রাতে ইশার সালাতের পরে বা ঘুমাতে যাওয়ার আগে এই ওযীফা দুইটি পালন করবেন।

কুরআন কারীমের ওযীফা

কুরআন কারীম মহান আল্লাহর বাণী। মানব জাতির জন্য আল্লাহর মহা নেয়ামত। কুরআন আল্লাহর জীবন্ত মু'জিজা। কুরআন তিলাওয়াতকারী নিজের মানবীয় মুখে মহান আল্লাহর বাণী ধারণ ও উচ্চারণ করে। সৃষ্টির জন্য এর চেয়ে বড় নেয়ামত আর কী হতে পারে? যে মানুষ ঈমান ও ইসলামের দাবী করেও কুরআন তিলাওয়াত করতে শেখে নি তার চেয়ে হতভাগা আর কে হতে পারে?

সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর যিক্‌র হলো কুরআন তিলাওয়াত করা, কুরআনের অর্থ অনুধাবন করা, কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা করা, কুরআন শিক্ষা করা, কুরআন শিক্ষা দান করা, কুরআনের আলোচনা করা ও সর্বোপরি কুরআনের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করা – এগুলি সবই যিক্‌র। শুধু তাই নয়। এগুলিই সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র। উপরে "যিকিরের" যত ফযীলত ও সাওয়াবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা পূর্ণতম রূপে অর্জিত হবে কুরআন কারীম তিলাওয়াত, অনুধাবন ও চর্চার মাধ্যমে। এছাড়া কুরআন তিলওয়াত, অনুধাবন ও পালনের অতিরিক্ত অফুরন্ত সাওয়াব, পুরস্কার ও মর্যাদার কথা কুরআন ও হাদীসে ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বোপরি কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে আত্মার প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হয় সবচেয়ে বেশি।

প্রত্যেক মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব হলো বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত শেখা, নিয়মিত তিলাওয়াত করা ও যথাসাধ্য অর্থ বুঝার চেষ্টা করা। প্রতিদিন আধাঘন্টা করে সময় দিলেই মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত শেখা যায়। একবার হৃদয়পটে কুরআনের মর্যাদা ছবিটা আঁকতে ও কুরআনের ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারলে প্রতিদিন কিছু সময় কুরআনের জন্য প্রদান খুবই সহজ ও আনন্দের কাজে পরিণত হবে।

দরুদের ফযীলত ও গুরুত্ব ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। সালাতুল ইশার পরে বা ঘুমাতে যাওয়ার আগে এই ওযীফা দুইটি পালন করবেন। এখানে ঘুমানোর আগে পালনের ওযীফার মধ্যে এই দুইটিকে উল্লেখ করব। কারণ সাধারণত আমাদের জন্য শেষ রাত্রে উঠে এগুলি পালন কষ্টকর হয়।

চতুর্থ ওযীফা : রাত্রে বিছানায় শয়ন করার আগে ও পরে

মুমিনের দিনের শুরু হয় তার প্রভুর স্মরণ ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে। সমাপ্তিও করতে হবে সেভাবে। তাহলে তার পুরো জীবন আল্লাহর করুণা ও বরকতে সিক্ত হবে। সত্যিকারের পবিত্র, উৎকণ্ঠামুক্ত ও আল্লাহর প্রেম ও আস্থায় ভরপুর হৃদয় ও জীবন লাভ করবেন তিনি। তার জীবনের সকল কর্মই আখেরাতের পাথেয়তে পরিণত হবে।

ক) শয়নের পূর্বে

ঘুমানোর পূর্বে অন্তত আধাঘন্টা সময় হাতে রেখে ওযু করে পবিত্র হোন। যারা শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পালন করতে পারবেন না তাঁর এই সময়ে কয়েক রাক'আত "রাতের সালাত" বা কিয়ামুল্লাইল (তাহাজ্জুদ) ও বিতর আদায় করে সাধ্যমত ১০/১৫ মিনিট বা আধাঘন্টা তিলাওয়াত করুন। প্রতিদিনের জন্য সাধ্যমত ২/৪ পৃষ্ঠা ওযীফা করে নিন। সম্ভব হলে তিলাওয়াতের সাথে সাথে যে কোন নির্ভরযোগ্য অনুবাদ বা তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে অর্থ বুঝার চেষ্টা করুন। অসুবিধা হলে তরজমা ও তাফসীরের জন্য অন্য একটি অবসর সময় নির্ধারণ করবেন।

কুরআন কারীম নিয়মিত ধারাবাহিকভাবে পাঠ করতে হবে। যেন প্রতি মাসে বা কয়েক মাসে একবার খতম করা যায়। তবে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমানোর পূর্বে নিম্নের সূরাগুলি পাঠ করতেন :

১) সূরা বনী ইসরাঈল (কুরআন কারীমের ১৬ নং সূরা)
২) সূরা সাজদা, (কুরআন কারীমের ৩২ নং সূরা)
৩) সূরা যুমার (কুরআন কারীমের ৩৯ নং সূরা)
৪) সূরা মুলক (কুরআন কারীমের ৬৭ নং সূরা)

এজন্য আমরা এগুলিকে প্রতিদিন রাত্রে ঘুমানোর আগে ওযীফা হিসাবে পাঠ করতে পারি। ১০/১৫ মিনিট ধারাবাহিক তিলাওয়াতের পরে এই সূরাগুলি বা এগুলি থেকে দুইএকটি সূরা নিয়মিত পাঠ করবেন।

যারা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন না, অথচ কুরআনের কিছু বড় বা ছোট সূরা মুখস্থ আছে, যেমন সূরা রাহমান, সূরা ইয়াসিন ইত্যাদি তারা এই সময়ে সেগুলি পাঠ করতে পারেন। তবে দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত শিখে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

কুরআন তিলাওয়াতের পরে যথাসম্ভব বেশি দরুদ পাঠের চেষ্টা করুন। অন্তত, একশতবার দরুদ-সালাম পাঠ ওযীফা হিসাবে গ্রহণ করুন।

এরপর মনের আবেগ অনুসারে কমবেশি কয়েক মিনিট মুনাজাত করুন। নিজের ও জীবিত ও মৃত আপনজন, বুজুর্গ, আলেম, মাশাইখ ও আল্লাহর জন্য যাদের মহব্বত করেন সকলের জন্য দোয়া করুন। সারাদিনে পরিবার বা সমাজের কারো ব্যবহারে কষ্ট পেলে, বিরক্ত হলে আল্লাহ কাছে নিজের ও তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিজের মনের সকল ব্যথা, কষ্ট, অসুবিধা, আকুতি মহান আল্লাহর দরবারে পেশ করে সাহায্য ও ত্রাণ প্রার্থনা করুন। আল্লাহর রহমত, তাওফীক, নির্দেশনা ও কবুলিয়্যত চান। নিজেকে পরিপূর্ণভাবে তাঁর দয়ার উপর ন্যস্ত করে বিছানায় গমন করুন।

খ) শয়নের পরে

১) ১০০ তাসবীহঃ ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ', ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার'। ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সাংসারিক কাজে তাকে সাহায্য করার জন্য একজন খাদেমা চাইলে তিনি তাঁকে এই তাসবীহগুলি ঘুমানোর পূর্বে পাঠ করতে নির্দেশ দেন।

২) ১ বার আয়াতুল কুরসী। ঘুমানোর আগে এ আয়াতটি পাঠ করলে সারারাত আল্লাহর পক্ষ থেকে হেফাজত করা হবে বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

৩) ১ বার সূরা বাকারার শেষ দু আয়াত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যদি কেউ রাতে এ দু আয়াত পাঠ করে তবে তা তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে।

৪) ১ বার সূরা কা-ফিরূনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সূরা পড়ে ঘুমাতে বলেছেন এবং বলেছেন এ হলো শির্ক থেকে বিমুক্তি।

৫) ১ বার সূরা ইখলাসঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে বলেন, তোমরা কি পারবে না রাতে কুরআন কারীমের একতৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে ? বিষয়টি তাঁদের কাছে কষ্টকর মনে হলো। তাঁরা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে কে-ই বা তা পারবে ? তখন তিনি বলেন : 'কুল হুআল্লাহু আহাদ' সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ।

৬) সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করে শরীরে বুলানো (৩ বার)

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আচরিত সুন্নাত হলো ঘুমানোর পূর্বে দুই হাত একত্র করে এই সূরাগুলি পাঠ করে হাতে ফুঁ দিয়ে হাত দু'টি যথাসম্ভব শরীরের সর্বত্র বুলানো। এভাবে ৩ বার। তিনি হাত বুলানোর সময় মাথা, মুখ ও শরীরের সামনের দিক থেকে শুরু করতেন।

৭) বিশেষ মুনাজাত একবার

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

উচ্চারণ : আলা-হুম্মা, রাব্বাস সামা-ওয়া-তি ওয়ারাব্বাল আরদ্বি ওয়ারাব্বাল 'আরশিল 'আযীম। রাব্বানা- ওয়ারাব্বা কুল্লি শাইয়িন, ফা-লিকিল হাব্বি ওয়ান নাওয়া-। ওয়া মুনযিলাত তাওরা-তি ওয়াল ইনজীলি ওয়াল ফুরকা-ন। আ'ঊযু বিকা মিন শার্‌রি কুলি-শাইয়িন আনতা আ-খিযুম বিনা-সিয়্যাতিহী। আলা-হুম্মা, আনতাল আউআলু, ফালাইসা ক্বাবলাকা শাইউন। ওয়া আনতাল আ-খিরু ফালাইসা বা'দাকা শাইউন। ওয়া আনতায যা-হিরু ফালাইসা ফাউক্বাকা শাইউন। ওয়া আনতাল বা-তিনু ফালাইসা দূনাকা শাইউন। ইকদ্বি আন্নাদ দাইনা ওয়া আগনিনা- মিনাল ফাক্বর।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আসমানসমূহ ও জমিনের প্রভু এবং মহান আরশের প্রভু, আমাদের প্রভু এবং সবকিছুর প্রভু, যিনি অঙ্কুরিত করেন শস্য বীজ ও আঁটি, যিনি নাজিল করেছেন তাওরাত, ইঞ্জিল ও ফুরকান ; আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আপনার কাছে আপনার নিয়ন্ত্রণে যত কিছু রয়েছে সবকিছুর অকল্যাণ ও অমঙ্গল থেকে। হে আল্লাহ, আপনিই প্রথম, আপনার পূর্বে আর কিছুই নেই। এবং আপনিই শেষ, আপনার পরে আর কিছুই নেই। এবং আপনিই প্রকাশ্য, আপনার উপরে আর কিছুই নেই। এবং আপনিই গোপন, আপনার নিচে আর কিছুই নেই। আপনি আমাদের ঋণমুক্ত করুন এবং আমাদেরকে দারিদ্র থেকে মুক্তি দিয়ে সচ্ছলতা প্রদান করুন।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমা (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীকে বিছানায় শয়ন করার পরে (ডান কাতে শুয়ে) এ মুনাজাতটি পাঠ করতে শিক্ষা দিতেন।

৮) ঘুমের আগে সর্বশেষ মুনাজাত, একবার

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

উচ্চারণ : আলা-হুম্মা, আসলামতু নাফসী ইলাইকা, ওয়াফাওআদ্বতু আমরী ইলাইকা,ওয়া আলজা'তু যাহরী ইলাইকা, রাগবাতান ওয়ারাহবাতান ইলাইকা, লা- মালজাআ ওয়ালা- মানজা- মিনকা ইলা- ইলাইকা। আ-মানতু বিকিতা-বিকালাযী আনযালতা, ওয়াবি নাবিয়্যিকালাযী আরসালতা।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমি সমর্পণ করলাম আমাকে আপনার নিকট, দায়িত্বার্পণ করলাম আপনাকে আমার যাবতীয় কর্মের, আমার পৃষ্ঠকে আপনার আশ্রয়ে সমর্পিত করলাম, আপনার প্রতি আশা ও ভয়ের সাথে। আপনার নিকট থেকে আপনি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল নেই ও কোনো মুক্তির স্থান নেই। আমি ঈমান এনেছি আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার উপর এবং আপনি যে নবী (ﷺ) প্রেরণ করেছেন তার উপর।"

বারা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন, "যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন নামাযের ওযুর মতো ওযু করবে। এরপর ডান কাতে শুয়ে বলবেঃ (উপরের বাক্যগুলি)। এই বাক্যগুলি তোমার শেষ কথা হবে। যে ব্যক্তি এই দোয়া পাঠের পরে সেই রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করবে সেই ব্যক্তি ফিতরাতের উপরে (নিষ্পাপভাবে) মৃত্যু বরণ করবে। আর যদি বেঁচে থাকে তাহলে কল্যাণময় দিবস শুরু করবে।"

এভাবে প্রভুর কাছে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে সমর্পন করে ঘুমিয়ে পড়ুন। মহান প্রভুর উপর গভীর আস্থাশীল মুমিন সাধারণত উৎকণ্ঠামুক্ত হন। তাই চিন্তাহীন ভারমুক্ত হৃদয়ে অতি সহজেই ঘুমিয়ে পড়েন। তারপরও অনেক সময় সাংসারিক সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা মস্তিষ্ককে ভারী করে। বারবার বিভিন্ন উৎকণ্ঠা বা চিন্তা মাথায় আসে এবং ঘুম আসতে দেয় না। এভাবে ঘুম আসতে দেরী হলে জাগতিক অপ্রয়োজনীয় বা হিংসা, বিদ্বেষ, বিরক্তি বা অহংকার উদ্রেককারী চিন্তা কল্পনায় মনকে না ছুটিয়ে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে নিশ্বাসের সাথে মনের মধ্যে যে কোন যিক্‌র অনুভব করতে পারেন। যেমন মনে মনে নিশ্বাসের সাথে সাথে "লা ইলা-হা ইলাল্লা-হ" অনুভব করুন। নিজের মস্তিষ্ক, হৃদয় ও অনুভবকে এই যিক্‌রময় শ্বাস দিয়ে পবিত্র করার অনুভূতি মনে আনতে পারেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘুম এসে যাবে।

গ) রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেলে

রাত্রে যে কোনো সময় ঘুম ভাঙ্গলে তাহাজ্জুদ আদায় করা যায়, তবে শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ আদায় উত্তম। রাতে ঘুম ভাঙ্গলে উঠার ইচ্ছা থাক বা আবার ঘুমের রাজ্যে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা থাক সর্বাবস্থায় নিম্নের যিক্‌রটি বলবেনঃ

لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّه

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইলাল্লা-হু, ওয়া'হদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল 'হামদ, ওয়া হুআ 'আলা- কুলি-শাইয়্যিন ক্বাদীর, 'আল-'হামদু লিলাহ', ওয়া 'সুব'হা-নাল-হ', ওয়া লা- ইলা-হা ইলাল্লা-হু, ওয়া 'আলা-হু আকবার', লা- 'হাওলা ওয়া লা-ক্বুওয়াতা ইলা-বিলা-হ।

অর্থ : "আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, এবং প্রশংসা তাঁরই। এবং তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাবান। সকল প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। কোনো অবলম্বন নেই, কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহর (সাহায্য) ছাড়া।"

রাসূলুলাহ ﷺ বলেছে'ন, "যদি কারো রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায় অতঃপর সে উপরের যিকিরের বাক্যগুলি পাঠ করে এবং এরপর সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় অথবা কোনো প্রকার দোয়া করে বা কিছু চায় তাহলে তার দোয়া কবুল করা হবে। আর যদি সে এরপর উঠে ওযু করে (তাহাজ্জুদের) নামায আদায় করে তাহলে তার নামায কবুল করা হবে।"

যিকিরের মাজলিস

'মাজলিস' শব্দের অর্থ বৈঠক, বসা , পড়ঁহপরষ, ধংংবসনষু ইত্যাদি। এক ব্যক্তি একাকী কোথাও সামান্য সময়ের জন্য বসলেও তাকে আরবিতে 'মাজলিস' বলা হবে। অনুরূপভাবে দুই বা ততোধিক মানুষ একত্রে কিছুক্ষণের জন্য বসলে তাকেও মাজলিস বলা হবে। সাধারণভাবে 'মাজলিস' বলতে অল্প বা বেশি সময়ের জন্য একাধিক ব্যক্তির একত্রে বসাকে বুঝানো হয়।

মাজলিসে আল্লাহর যিক্‌র দুই প্রকারে হতে পারে। প্রথম প্রকার হলো – মাজলিস, সমাবেশ বা বৈঠকটি জাগতিক কোনো বিষয় কেন্দ্রিক হবে, তবে মাজলিসের মধ্যে মুমিন মাঝে মধ্যে আল্লাহর স্মরণ করবেন। দ্বিতীয় প্রকার হলো – যে মাজলিসটি বৈশিষ্ঠগতভাবে আল্লাহর যিক্‌র-কেন্দ্রিক হবে। উভয় প্রকার মাজলিসে মহান আল্লাহর যিক্‌র করার মর্যাদা, গুরুত্ব ও অফুরন্ত সাওয়াব সম্পর্কে হাদীস শরীফে অনেক নির্দেশনা এসেছে। আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে দ্বিতীয় প্রকার মাজলিস বা "যিকিরের মাজলিস" সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই। মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

'যিকিরের মাজলিস' হলো ঐ মাজলিস যেখানে কয়েকজন মুমিন একত্রিত হয়ে আল্লাহর গুণাবলী, নেয়ামত, বরকত, তাঁর রাসূল (ﷺ), তাঁর দ্বীন, তাঁর বিধান, পুরস্কার, তাঁর সন্তুষ্টির পথে অগ্রসর হওয়ার উপায় ইত্যাদির আলোচনা করেন। আল্লাহর প্রশংসা,

মর্যাদা, মহত্ব, পবিত্রতা ও একত্ব উল্লেখ করেন। তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। তাঁর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ চেয়ে প্রার্থনা করেন। এক মাজলিসে সকল প্রকারের যিক্‌র একত্রিত হতে পারে বা কিছু কিছু যিক্‌রও হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "যখনই কোনো সম্প্রদায় (কিছু মানুষ) বসে মহা মহিমান্বিত আলাহর স্মরণ (যিক্‌র) করে, তখনই ফিরিশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে নেন, রহমত তাদেরকে আবৃত করে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয় এবং আল্লাহ তাদের স্মরণ (যিক্‌র) করেন তাঁর (আল্লাহর) নিকট যারা আছেন তাদের মধ্যে।" তিনি আরো বলেন, "যখনই কোনো সম্প্রদায় (কিছু মানুষ) একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিকিরে রত হয়, এদ্বারা তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া কিছুই চায় না, তখনই আসমান থেকে একজন আহ্বানকারী তাঁদেরকে ডেকে বলেন, তোমরা পরিপূর্ণ ক্ষমাপ্রাপ্ত-গোনাহমুক্ত হয়ে উঠে যাও, তোমাদের পাপগুলিকে পুণ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে।" অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন, "কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহ কিছু মানুষকে উঠাবেন যাঁদের চেহারায় নূর উদ্ভাসিত থাকবে। তাঁরা মুক্তাখচিত মিম্বরের উপর থাকবে। সকল মানুষ যাঁদের নেয়ামত দেখে নিজেদের জন্য এই নেয়ামত কামনা করবে। তাঁরা নবী নন বা শহীদও নন।" তখন একজন বেদুঈন হাঁটু গেড়ে বসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তাঁদের বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে বর্ণনা করুন, যেন আমরা তাঁদের চিনতে পারি। তিনি বলেন : "তাঁরা ঐসব মানুষ যাঁরা একে অপরকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে, বিভিন্ন গোত্র বা গোষ্ঠী ও বিভিন্ন এলাকা বা দেশ থেকে এসে তাঁরা আল্লাহর যিকিরের জন্য একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিক্‌র করবে।"

যিকিরের মাজলিসের যিক্‌র

হাদীস শরীফের নির্দেশনা অনুসারে আমরা জানাতে পারি যে, যিকিরের মাজলিস মূলত ঈমান ও ইল্‌ম বৃদ্ধির মাজলিস। এই মাজলিসের মূল হলো আলোচনা ও ওয়াজ। আমরা সাধারণত মনে করি যে, যিকিরের মাজলিস অর্থ একাকী পালনীয় যিক্‌র আযকারগুলি একত্রে পালন করার মাজলিস। ধারণাটি ভুল ও সুন্নাতের খেলাফ।

যিক্‌র মূলত দুই প্রকার – **প্রথমত**, স্মরণ করা এবং **দ্বিতীয়ত**, স্মরণ করানো। যিকিরের মাজলিসের অন্যতম প্রধান যিক্‌র হলো স্মরণ করানো বা ওয়াজ আলোচনা। আমাদের বুঝতে হবে যে, তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি যিক্‌র মুমিন একাকী পালন করতে পারেন। কিন্তু ইল্‌ম, তাকওয়া ও আল্লাহর পথে চলার আগ্রহ বৃদ্ধিমূলক আলোচনা একা করা যায় না বা করতে অসুবিধা। যিকিরের মাজলিসে এই বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এসকল আলোচনা, দোয়া ইত্যাদির মধ্যে আলোচনার আবেগ ও প্রেরণা অনুসারে তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ, সালাত, সালাম ইত্যাদি মাসনূন যিক্‌র মাসনূন পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে। যখন আলোচনার ফলে বা বক্তার কথায় উপস্থিত যাকিরগণের হৃদয়ে তওবার আবেগ আসবে, তখন ইস্তিগফার করবেন, তাওহীদের আবেগ আসলে তাহলীল করবেন, কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার প্রেরণা আসলে তাহমীদ করবেন। এভাবে আলোচনার বিষয়, আবেগ ও প্রেরণা অনুসারে মাজলিসের সকলে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে আদব, ভয়, বিনয় ও ভক্তির সাথে অনুচ্চস্বরে তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি মাসনূন যিক্‌র করবেন।

হাদীস শরীফে বিশেষভাবে যিকিরের মাজলিসে নিম্নের যিক্‌রগুলি পালনের কথা বলা হয়েছে : ১) কুরআন তিলওয়াত ও আলোচনা, ২) ঈমান ও তাকওয়া উদ্দীপক ওয়াজ ও আলোচনা, ৩) আল্লাহর নেয়ামতের আলোচনা করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, ৪) তাসবীহ বা 'সুব'হানাল্লাহ' বলা, ৫) তাকবীর বা 'আল্লাহু আকবার' বলা, ৬) তাহলীল বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, ৭) তাহমীদ বা 'আল হামদু লিল্লাহ' বলা, ৮) সালাত বা দরুদ পাঠ করা, ৯) দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও মঙ্গল প্রার্থনা করে দোয়া করা, ১০) জান্নাত প্রার্থনা করা, ১০) জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা, ১১) ইস্তিগফার করা বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, বিশেষভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে আন্তরিকতা ও আবেগের সাথে কাঁদাকাটি করা।

মুমিনের জীবনে এই ধরণের যিকিরের মাজলিসের গুরুত্ব অপরিসীম। ঈমান বৃদ্ধি, ইল্‌ম বৃদ্ধি, যিকিরের আনন্দ বৃদ্ধি, আন্তরিকতা বৃদ্ধি, মাগফিরাত লাভ, আল্লাহর পথে চলার প্রেরণা ও জ্ঞান লাভের জন্য যিকিরের মাজলিস মুমিনের জীবনে অপরিহার্য।

আমাদের দৈনন্দিন সাংসারিক ও জাগতিক কাজকর্ম, সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে আমাদের সংমিশ্রণ, লেনদেন ও কথাবার্তা আমাদের হৃদয়গুলিকে কঠিন করে তোলে। মৃত্যুর চিন্তা, আখেরাতের চিন্তা, তাওবার চিন্তা ইত্যাদি কল্যাণময় অনুভূতি একটু দূরে সরে যায়। নিয়মিত ও সার্বক্ষণিক ব্যক্তিগত যিকিরের পাশাপাশি যিকিরের মাজলিস আমাদের হৃদয়গুলিকে পবিত্র ও আখেরাতমুখী করার জন্য খুবই উপকারী। হৃদয়ের কাঠিন্য দূর করতে, হৃদয়কে আখেরাতমুখী করতে, আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূল ﷺ-এর মহব্বত দিয়ে হৃদয়কে পূর্ণ করতে, আল্লাহর স্মরণের ও তাঁর ভয়ে চোখের পানি দিয়ে হৃদয়কে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করতে যিকিরের মাজলিস অতীব প্রয়োজনীয়।

যিকিরের মাজলিসের সঙ্গী

সঙ্গ, সাহচর্য বা সুহবাত আল্লাহর পথে চলার অন্যতম ওসীলা বা উপকরণ। সাধারণত, আমরা সকলেই ইসলামের ফরয ওয়াজিব, হালাল, হারাম ইত্যাদি জানি। তা সত্বেও আমরা জেনে শুনে অগণিত পাপের মধ্যে নিমজ্জিত থাকি। সৎকর্মশীল মানুষদের সাহচর্য আমাদের জ্ঞানকে কর্মে পরিণত করতে সাহায্য করে। অনেক সময় আমরা ধর্ম পালন, আল্লাহর পথে চলা ইত্যাদিকে খুবই কঠিন বা অসম্ভব কিছু মনে করি। সৎকর্মশীলদের সাহচর্য বা সুহবাত আমাদেরকে এই বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে। তাঁদের র্কমজীবন আমাদের অনুপ্রাণিত করে। যত বেশী আমরা সৎকর্মশীলগণের সুহবতে থাকতে পারব ততই আমরা উপকৃত হব। এজন্য আমাদের সুহবাত গ্রহণের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে এবং যত বেশি সম্ভব সৎকর্মশীলগণের সাথে যে কোন ভাবে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (ﷺ), আলাহর দ্বীন, আহকাম, পুরস্কার, শাস্তি, ইত্যাদির যিকিরে সময় কাটাতে হবে।

সুহবতের জন্য এমন কিছু মানুষকে বেছে নিন যাঁদের সাথে আপনার সম্পর্ক শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। যাঁদের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান ও তাকওয়া আছে। যাঁদের মধ্যে ইল্‌ম ও আমলের সমন্বয় আছে। যাঁদেরকে দেখলে ও যাঁদের কাছে বসলে আল্লাহর পথে চলার, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর পথে চলার, তাঁর সুন্নাত অনুসরণের প্রেরণা পাওয়া যায়।

যিকিরের মাজলিসের ধরন

আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বতের ও সুহবাতের জন্য যাদের বেছে নিয়েছেন তাদের সাথে নিয়মিত বা অনিয়মিত যিকিরের মাজলিসে বসুন।

যিকিরের মাজলিস দুজনেও হতে পারে, অনেকে মিলেও হতে পারে। মাজলিসে একজন পরিচালক বা আলোচক থাকতে পারেন। আবার মাজলিসের প্রত্যেকেই কিছু কিছু আলোচনা করতে পারেন। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কিত যে কোন আলোচনাই যিকিরের মাজলিস। এখানে আমরা একটি সাধারণ মজলিস চিন্তা করি।

আলোচক মানুষের জীবনে আল্লাহর অগণিত নেয়ামত, বিশেষ করে হেদায়াতের নেয়ামত আলোচনা করে উপস্থিতির মনের মধ্যে হামদ ও শুকুরের অনুভূতি জাগ্রত করলেন। উপস্থিত সকলে আবেগ ও ভালবাসার সাথে কিছুক্ষণ আল্লাহর হামদ ও সানা করবেন ও কিছুক্ষণ প্রত্যেকে নিজে নিজে মনে মনে বা মৃদু স্বরে "আল-'হামদু লিলাহ" ও আলাহর প্রশংসা ও মর্যাদা প্রকাশক অন্যান্য মাসনূন বাক্য দ্বারা যিক্‌র করবেন।

আলোচক মানুষের পরিণতি, মৃত্যু ও আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করবেন। দুনিয়ার জীবনের অনিশ্চয়তা, ক্ষণস্থায়িত্ব, আখেরাতের স্থায়িত্ব, যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর আগমন, পাপের পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে হৃদয়গুলিকে আখেরাতমুখী করবেন।

মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের কিভাবে ভালবাসেন, আর বান্দা তাঁকে ভালবেসে কী মহান নেয়ামত পেতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করবেন। হৃদয়কে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য পার্থিব বিষয়ের লোভ ও ভালবাসায় জড়ানোর পরিণতি আলোচনা করবেন। আল্লাহর দ্বীন জানতে, পালন করতে, প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা ও এর সুমহান পুরস্কার বিষয়ে আলোচনা করবেন। আলোচক ও উপস্থিতি আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে মনের আবেগ অনুসারে "লা- ইলা-হা ইলাল্লাহ" ও অন্যান্য মাসনূন যিক্‌র পালন করবেন। প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে।

আলোচক পাপের ক্ষতি ও ভয়াবহতা, তাওবা ও ইস্তিগফারের প্রয়োজনীয়তা, ফযীলত, গুরুত্ব ইত্যাদি আলোচনা করে হৃদয়ের মধ্যে তাওবার প্রেরণা সৃষ্টি করবেন। সবাই নিজের মতো আবেগ সহকারে তাওবা করবেন ও ইস্তিগফারের যিক্‌র করবেন। কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন তাওবার ঘটনা এবং এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীস আলোচনা ও চিন্তা করবেন।

রাসূলুলাহ ﷺ-কে প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে কত বড় নেয়ামত দিলেন, তিনি আমাদের জন্য কত কষ্ট করলেন, আমাদেরকে কত ভালবসাতেন এবং তাঁর প্রতি আমাদের কত বেশি ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার প্রয়োজন তা আলোচনা করবেন। এ বিষয়ক কুরআন ও হাদীস আলোচনা করবেন। আলোচনার মধ্যে সকলে আবেগ, ভক্তি ও ভালবাসার সাথে প্রত্যেকে নিজের মতো মনে মনে বা মৃদুস্বরে দরুদ ও সালাম পাঠ করবেন।

আলোচক ও উপস্থিতি কুরআনের বিভিন্ন আয়াত আলোচনা ও তার অর্থ চিন্তা করবেন। এ সকল আয়াতের, ভাব ও মর্মকে হৃদয়ের মধ্যে গেঁথে নেওয়ার চেষ্টা করবেন।

পূর্ববর্তী যুগের নেককার বুজুর্গগণ, বিশেষত সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত নবীগণ ও পূর্ববর্তী যুগের বুজুর্গগণের আল্লাহর প্রেম, তাওবা, জিহাদ, যুহদ, তাকওয়া, সবর ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করবেন। এ সকল আলোচনার ফাঁকে মনের আবেগ ও প্রেরণা অনুসারে মাসনূন বাক্যদ্বারা মাসনূনভাবে আল্লাহর যিক্‌র করবেন।

সকল মুসলমানের জন্য প্রাণখুলে দোয়া করবেন। পূর্ববর্তী সকল মুসলিম, বিশেষত নেককার বান্দাদের জন্য মাগফিরাত ও মহব্বত প্রার্থনা করবেন। উম্মতে মুহাম্মাদীর হেদায়াত, বিজয় ও দুনিয়া-আখেরাতের সার্বিক কল্যাণ প্রার্থনা করবেন। এভাবে বা অন্য যে কোন ভাবে ঈমান ও তাকওয়া উদ্দীপক মাজলিস কায়েম করতে হবে।

মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সঠিক সঙ্গী গ্রহণ ও আমলের তাওফীক প্রদান করেন, কবুল করেন এবং আমাদের, আমাদের পিতামাতা, উস্তাদ, মাশাইখ, আত্মীয় পরিজন ও সকল মুসলিম নরনারীকে ক্ষমা করে দেন।

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات